দিবারাত্রির কাব্য :
একটি বস্তুসঙ্কেতের কল্পনামূলক রূপক কাহিনী . . . . .

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

ডি, এম্, লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিশ্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা

প্রকাশক : শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম্, লাইব্রেরী
৪২ কর্ণওয়ালিশ্ ষ্ট্রীট
কলিকাতা
১৩৪৩

সাত সিকা

প্রিন্টার — শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডল
আলেকজান্দ্রা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২৭, কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

দিবারাত্রির কাব্য আমার একুশ বছর বয়সের রচনা। শুধু প্রেমকে ভিত্তি করে বই লেখার সাহস ওই বয়সেই থাকে। কয়েক বছর তাকে তোলা ছিল। অনেক পরিবর্ত্তন করে গত বছর বঙ্গশ্রীতে প্রকাশ করি।

দিবারাত্রির কাব্য পড়তে বসে যদি কখনো মনে হয় বইখানা খাপছাড়া, অস্বাভাবিক,—তখন মনে রাখতে হবে এটি গল্পও নয় উপন্যাসও নয়, রূপক কাহিনী। রূপকের এ একটা নূতন রূপ। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যাবে বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক দিয়ে সীমাবদ্ধ করে নিলে মানুষের কতগুলি অনুভূতি যা দাঁড়ায়, সেইগুলিকেই মানুষের রূপ দেওয়া হয়েছে। চরিত্রগুলি কেউ মানুষ নয়, মানুষের Projection—মানুষের এক এক টুকরো মানসিক অংশ।

সকাল সাতটার সময় রূপাইকুড়ার থানার সামনে হেরম্বের গাড়ী দাঁড়াল।

বিস্‌না পর্য্যন্ত মোটরে আসতে তার বিশেষ কষ্ট হয় নি। কিন্তু রাত বারোটা থেকে এখন পর্য্যন্ত গরুর গাড়ীর ঝাঁকানিতে সর্ব্বাঙ্গে ব্যথা ধরে গেছে। গাড়ী থেকে নেমে শরীরটাকে টান করে দাঁড়িয়ে হেরম্ব আরাম বোধ করল। এক টিপ নস্য নিয়ে সে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগল।

পূব আর পশ্চিমে কেবল প্রান্তর আর দিগন্ত। মাঝে মাঝে দু'একটি গ্রামের সবুজ চাপড়া বসানো আছে, বৈচিত্র্য শুধু এই। উত্তরে কেবল পাহাড়। একটি দু'টি নয়, ধোঁয়ার নৈবিদ্যের মত অজস্র পাহাড় গায়ে গায়ে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে—অতিক্রম করে যাওয়ার সাধ্য চোখের নেই আকাশের সঙ্গে এমনি নিবিড় মিতালি। দক্ষিণে প্রায় আধমাইল তফাতে একটি গ্রামের ঘনসন্নিবিষ্ট গাছপালা ও কতগুলি মাটির ঘর চোখে পড়ে। অনুমান হয় যে, ওটিই রূপাইকুড়া গ্রাম। গ্রামটির ঠিক উপরে আকাশে এখন রূপার ছড়াছড়ি। তবে সেগুলি আসল রূপা নয়, মেঘ।

গাড়ী দাঁড়াতে দেখে থানার জমাদার মতিলাল বেরিয়ে এসেছিল। হেরম্বকে সেই সসম্মানে অভ্যর্থনা করল।

একটু অর্থহীন নিরীহ হাসি হেসে বলল, 'আজ্ঞে না, বাবু নেই। বরকাপাশীতে কাল একটা খুন হয়েছে, ভোর ভোর ঘোড়ায় চেপে বাবু তার তদারকে গেছেন। ওবেলা ফিরবেন—ঘরে গিয়ে আপনি বসুন, আমি জিনিষপত্র নামিয়ে নিচ্ছি। এ কিষণ! কিষণ! ইধার আও তো।'

আপিস ও সিপাহীদের ছোট ব্যারাকটির মধ্যে গম্ভীর লালিত্যহীন থানার বাগান। বাগানের শেষপ্রান্তে দারোগাবাবুর কোয়ার্টার। চুণকাম-করা কাঁচা ইটের দেয়াল, তলার দিকটা মেঝে থেকে তিন হাত উঁচু পর্য্যন্ত আলকাতরা মাখানো। চাল শণের। এ বছর বর্ষা নামার আগেই চালের শণ সমস্ত বদলে ফেলায় সকাল বেলার আলোতে বাড়ীটিকে ঝকঝকে দেখাচ্ছে। বাড়ীর সামনে চওড়া বারান্দা।

ভিতরে যাবার দরজার পর্দ্দা ফাঁক করে একটি সুন্দর মুখ উঁকি দিচ্ছিল। হেরম্ব বারান্দার সামনে এগিয়ে আসতে খসে'-পড়া ঘোমটাটি মাথায় তুলে দেবার প্রয়োজনে মুখখানা এক মুহূর্ত্তের জন্য আড়ালে চলে গেল।

তারপর পর্দ্দা সরিয়ে আস্ত মানুষটাই বেরিয়ে এল বারান্দায়।

আগ্রহ ও উত্তেজনা সংযত রেখে সহজ ভাবেই বলল, 'আসুন। রাস্তায় কষ্ট হয় নি?'

'হয়েছিল। এই মুহূর্ত্তে সব ভুলে গেলাম সুপ্রিয়া।'

'আমায় দেখেই?' কোমল হাসিতে সুপ্রিয়ার মুখ ভরে গেল, 'বিশ্বাস করা একটু শক্ত ঠেকছে। যে রাস্তা আর যে গাড়ী, আসবার

সময় আমি শুধু কাঁদতে বাকী রেখেছিলাম। পাঁচ বছর যার খোঁজ-খবর নেওয়াও দরকার মনে করেন নি, তাকে দেখে অত কষ্ট কেউ ভুলতে পারে?'

'আমি পারি। কষ্ট হলে যদি সহজে অবহেলাই করতে না পারব, পাঁচ বছর তবে তোর খোঁজ-খবর নিলাম না কেন?'

'কত সংক্ষেপে কত বড় কৈফিয়ৎ! মেনে নিলাম ভাববেন না কিন্তু। আপনার সঙ্গে আমার ঢের ঝগড়া আছে। বাইরে দাঁড়িয়ে আর কথা নয়। ভেতরে চলুন। জামা খুলে গা উদ্‌লা করে দিন, পাখা নেড়ে আমি একটু হাত ব্যথা করি। স্নান করবেন তো? আপনার জন্যে এক টব জল তুলে রেখেছি। ইঁদারা থেকে তোলা কিনা, বেশ ঠাণ্ডা জল। স্নান করে আরাম পাবেন।'

সুপ্রিয়ার কথা বলার ভঙ্গীটি মনোরম। সকালবেলাই এখন একশ' চার ডিগ্রি গরমে মানুষ সন্তপ্ত হয়ে আছে। কিন্তু সুপ্রিয়ার যেন একটি দার্জ্জিলিঙের আবহাওয়ার আবেষ্টনী আছে। এত গরমেও তার কথার মাধুর্য্যের এক কণা বাষ্প হয়ে উড়ে যায় নি, তার কণ্ঠে শ্রান্তির আভাস দেখা দেয় নি। তার ইঁদারার জলের মতই সেও যেন জুড়িয়ে আছে।

বাইরের ঘরের ভিতর দিয়ে অন্দরের বারান্দা হয়ে হেরম্বকে সে একেবারে তার শোবার ঘরে নিয়ে গেল। যেতে যেতে হেরম্ব লক্ষ্য করে দেখল, চারিদিকে একটা অতিরিক্ত ঘসামাজা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ভাব। ঘর ও রোয়াকের ধোয়া মেঝে সবে শুকিয়ে উঠেছে, সাদা কালো দেয়ালের কোথাও একটু দাগ পর্য্যন্ত নেই। জলের বালতি,

ঘটি-বাটি, বসবার আসন প্রভৃতি টুকিটাকি জিনিষগুলি পর্য্যন্ত কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে স্বস্থানে অবস্থান করছে। স্থানভ্রষ্ট একটি চামচও বোধ হয় এ-বাড়ীর কোথাও আবিষ্কার করা যাবে না।

ঘরে ঢুকে সুপ্রিয়া বলল, 'ওই ইজিচেয়ারটাতে বসে সবচেয়ে আরাম হয়। জামা খুলে কাত হয়ে এলিয়ে পড়ুন। ছারপোকা নেই, কামড়াবে না।'

হেরম্ব জামা খুলে ইজিচেয়ারটাতে বসল। এলিয়ে পড়ার দরকার বোধ করল না।

'আমার আরামের আর কি কি ব্যবস্থা রেখেছিস বল তো?'

সুপ্রিয়া সত্যসত্যই পাখা নিয়ে তাকে বাতাস করা সুরু করে বলল, 'আরামের ব্যবস্থার কথা আর বলবেন না, হেরম্ববাবু। বিশ মাইলের মধ্যে চা'টি পর্য্যন্ত কিনতে পাওয়া যায় না, এ এমন বুনো দেশ। যে ক'দিন থাকবেন, আপনাকে কষ্ট করেই থাকতে হবে।'—সে একটু হাসল—'তবে কষ্ট আপনি সহজেই অবহেলা করতে পারেন, এই যা ভরসার কথা। নইলে মুস্কিলে পড়তাম।'

সুপ্রিয়ার এ ঘর সাজানো, ছবির মত সাজানো। বিছানার ধবধবে চাদরে কোথাও একটি কুঞ্চন নেই, বালিশগুলি নিটোল। দেওয়ালের গায়ে পেরেকের শেষ গর্ত্তটি চূণের তলে অদৃশ্য হয়েছে। এদিকের টেবিলে সুপ্রিয়া ও তার স্বামীর প্রসাধন-সামগ্রীগুলির একটি কোনদিনই হয়ত আর একটির গায়ে ঠেকে যাবে না, সেলাইয়ের কলের ঢাকনিটি চিরদিন এমনি ধূলিহীন হয়েই থাকবে। প্রতিদিন সুপ্রিয়া কতক্ষণ ঘর সাফ করে আর ঘর গোছায় হেরম্ব কল্পনা করে উঠতে পারছিল না।

সুপ্রিয়ার পাখার বাতাসে স্নিগ্ধ হতে হতেও সে একটু অস্বস্তি বোধ করছিল।

এক সময় একটু আচমকাই সে জিজ্ঞাসা করে বসল, 'দোকানের মত ঘর সাজিয়েছিস কেন?'

সুপ্রিয়া অপ্রতিভ হয়ে গেল।

'দোকানের মত?'

'দোকানের মত না হোক, বাড়াবাড়ি আছে একটু। তোর ভাল লাগে?'

'কি জানি।'

'কি জানি! ভাল লাগে কিনা জানিসনে কি রকম?'

'অত বুঝিনে। মুদ্রাদোষের মত হয়ে গেছে। না করেই বা কি করি বলুন? সারাদিন একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো মানুষের? একটা ছেলে দিয়ে ভগবান আবার কেড়ে নিলেন। বইটই পড়তে আমার ভাল লাগে না। এই সবই করি। কিন্তু—' সুপ্রিয়ার কথা বলার মধুর ভঙ্গী ফিরে এল, 'আমার কথা আগে কেন? আগে বলুন আপনার মা কেমন আছেন।'

'মা আশ্বিন মাসে স্বর্গে গেছেন।'

সুপ্রিয়া চমকে বলল, 'কি সর্ব্বনাশ!' তার দু'চোখ সজল হয়ে উঠল।

হেরম্ব বলল, 'মরবার আগে মা তোর কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন।'

সুপ্রিয়ার পাখা থেমে গিয়েছিল। আবার সেটা নাড়তে আরম্ভ করে বলল, 'আমাকে বড় ভালবাসতেন। আপনাকে হেরম্ববাবুর বলা

জন্য সকলের কাছে গাল খেয়েছি, তিনিই শুধু হেসে বলতেন, পাগলী মেয়ে।'

হেরম্ব বলল, 'তখন তুই পাগলীই ছিলি, সুপ্রিয়া।

সুপ্রিয়া চিন্তামগ্না হয়ে পড়েছিল, জবাব দিল না।

সুপ্রিয়া ভারি গৃহস্থ মেয়ে।

গোয়ালা আজ কি কারণে এত বেলাতেও আসে নি। সুপ্রিয়া নিজেই দুরন্ত গরুর বাঁট টেনে হেরম্বের চায়ের দুধ বার করল। উঠানেরই একপাশে দরমার বেড়ায় ঘেরা স্নানের জায়গা। হেরম্ব সেখানে স্নান করছিল। এই সময় বাইরে এসে তার দুধ দোওয়া দেখে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল।

সুপ্রিয়া বলল, 'বলক তোলা টাটকা দুধ খাবেন একটু? ভারি উপকারী। উনি রোজ খান। দুইব বেশী করে?'

হেরম্ব বলল, 'বলক তোলা দুধ শিশুতে খায়। অশোক বাড়ী ফিরলে তাকে খাওয়াস। এ কাজটা শিখলি কবে?'

'এ আবার শিখতে হয় নাকি!'

'হয়। কারণ, শিখিনি বলে আমি পারব না।'

সুপ্রিয়া হেসে বলল, 'পারবেন। দুধ দেবার জন্যে ভোর থেকে গরু আমার হামলাচ্ছে, বাঁটে হাত দিলে দুধ ঝরবে। তবে আপনাকে কাছেই ঘেঁষতে দেবে কিনা সন্দেহ,—গুঁতোবে হয়ত।'

'কাছে গেলেত! চাউনি দেখে ভাল বোধ হচ্ছে না।'

'বড় দুরন্ত। দু'বেলা দড়ি ছিঁড়বে, ধরতে গেলে শিং নেড়ে তেড়ে আসবে। কত মোটা শেকল দিয়ে বাঁধতে হয়েছে দেখছেন না? আমি খেতে দি' বলে আমায় কিছু বলে না।'

সুপ্রিয়া সস্নেহে তার গরুর গলা চুলকে দিল। বলল, 'ঘরেই আয়না চিরুণী আছে।'

গরুর সামনে কয়েক আঁটি খড় ফেলে দিয়ে সে রান্নাঘরে গেল। কাল রাত্রে ছানা কেটেছিল, তাই দিয়ে তৈরী করল সন্দেশ, সন্দেশ ভাল হল না বলে তার যে কি দুঃখ!

হেরম্বকে খেতে দিয়ে বলল, 'আপনি খাবেন কিনা, তাই আজ শত্রুতা করেছে।'

হেরম্ব সান্ত্বনা দিয়ে বলল, 'আহা হোক না, খাব বৈ ত নয়।'

'খাবার জন্যই তো খাবার, কিন্তু তাই বলে যা তা দেওয়া যায়? মিহি না হলে সে আবার সন্দেশ! কাল রাত্রে পড়লাম ফিট হয়ে, নইলে রাত্রেই করে রাখতাম। সারা রাত ফেলে রেখে সে ছানায় কি সন্দেশ হয়!'

হেরম্ব খাওয়া বন্ধ করে বলল, 'তোর না ফিট সেরে গিয়েছিল?'

'গিয়ে তো ছিল, এ বছর আবার হচ্ছে। কাল নিয়ে দু'বার হল রান্নাঘরে ছানা ডলছি, হঠাৎ মাথার মধ্যে এমনি ঝিমঝিম করে উঠল। তার পর আর কিছু মনে নেই। জ্ঞান হতে দেখি পাঁড়ে আর দাই গায়ে বালতি বালতি জল ঢালছে, রান্নাঘর ভেসে একেবারে পুকুর!'

'চা আনি।' হেরম্বকে কথা বলার অবকাশ না দিয়ে সুপ্রিয়া রান্নাঘরে চলে গেল।

চা এনে সে অন্য কথা পাড়ল।

'রাঁচীতে ক'দিন ছিলেন?'

'চারদিন।'

'এখানে কতদিন থাকবেন?'

'একদিন।'

সুপ্রিয়া ভ্রু কুঁচকে বলল, 'রক্ষে পেলেম। গেলেই বাঁচি।'

চায়ে চুমুক দিয়ে বাঁ হাতের তালুতে চিবুক ঘষে হেরম্ব বলল, 'আমাকে তুই ক'দিন রাখতে চাস?'

'দিন? বছর বলুন!'

একথা হেসে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। সুপ্রিয়া আকস্মিকতা পছন্দ করে না। ওর হিসাবে দিন নেই, মাস নেই, বছর দিয়ে ও জীবনকে ভাগ করেছে। ওর প্রকৃতির কল্পনাতীত সহিষ্ণুতা হেরম্বের অজানা নয়।

তবু তাকে বলতে হ'ল, 'বছর নয়, মাস নয়, সপ্তাহও নয়। একদিন। শুধু আজ।'

সুপ্রিয়া কথাটা বিশ্বাস করতে পারল না।

'ওবেলাই চলে যাবেন?'

'না, কাল সকালে।'

অনেকক্ষণ নীরব থেকে সুপ্রিয়া বলল, 'একদিন থাকবার জন্য এমন করে আপনার আসার দরকার কি ছিল? পাঁচ বছর খোঁজ নেন নি, আরও পাঁচ বছর নয় নিতেন না।'

চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে কাপড়ে মুখ মুছে হেরম্ব বলল, 'তাতে লাভ কি হত রে?'

সুপ্রিয়া পলকহীন চোখে চেয়ে থেকে বলল, 'আপনি বাড়ীতে এলে বাইরের ঘরে বসিয়ে এক কাপ চা আর একটু সুজি পাঠিয়ে দিতাম। মনে মনে বলতাম, আপদ বিদেয় হলেই বাঁচি।'

হেরম্ব একটু হেসে বলল, 'আচ্ছা, এবার দশ বছর পরে আসব। মনে তোর ক্ষোভ রাখব না, সুপ্রিয়া।'

সুপ্রিয়া আস্তে আস্তে বলল, 'আপনি তা পারেন। ছেলেমানুষ পেয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে আমার যখন বিয়ে দিয়েছিলেন তখনি জেনেছিলাম আপনার অসাধ্য কর্ম্ম নেই।'

হেরম্ব প্রতিবাদ করে বলল, 'আমি তোর বিয়ে দিইনি সুপ্রিয়া, তোর বাবা দিয়েছিলেন। হ্যাঁরে, বিয়ের সময় তোকে একটা উপহারও বোধ হয় আমি দিই নি। দিয়েছিলাম?'

সুপ্রিয়া শেষ কথাটা কানে তুলল না। বলল, 'বাবা বিয়ে দিয়েছিলেন বৈ কি! আমাকে ভজিয়ে ভজিয়ে রাজী করেছিল কে? কার মুখের বড় বড় ভবিষ্যদ্বাণী শুনে আমি ভেসে গিয়েছিলাম? কি সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কথা! কত কথার মানে বুঝি নি। তবু শুনে গা শিউরে উঠেছিল! আচ্ছা, সে সব কথা অভিধানে আছে?'

জবাব দিতে হেরম্বকে একটু ভাবতে হল। সুপ্রিয়ার ঝগড়া করার ইচ্ছা নেই এটা সে টের পেয়েছিল। কিন্তু তার অনেক দিনের জমানো নালিশ, কলহ না করলেও নালিশগুলি ও জানিয়ে রাখবে। না জানিয়ে ওর উপায় নেই। মনের নেপথ্যে এত অভিযোগ পুষে রাখলে মানসিক সুস্থতা কারো বজায় থাকে না। এখনকার মত কথাগুলি স্থগিত রাখলেও সুপ্রিয়ার চলবে না। সে কাল চলে যাবে, দু'চার বছরের মধ্যে

তার সঙ্গে দেখা হবার সম্ভাবনায় সুপ্রিয়া বিশ্বাস করে না। যা বলার আছে এখুনি সব বলে নিয়ে বাকী দিনটুকু নিশ্চিন্ত মনে অতিথির পরিচর্য্যা করবার সুযোগটাও সে বুঝি সৃষ্টি করে নিতে চায়। তার সংক্ষিপ্ত উপস্থিতির সময়টুকুর মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে পড়বার কারণটা সে গোড়াতেই বিনষ্ট করে দিতে চায়।

চোখের জলের মধ্যে সুপ্রিয়ার বক্তব্য শেষ হবে কিনা ভেবে হেরম্ব মনে মনে একটু ভীত হয়ে পড়েছিল।

'তোর ভালর জন্য যতটুকু বলা দরকার তার বেশী আমি কিছুই বলি নি, সুপ্রিয়া।'

'না বললে আমার মন্দটা কি হত? স্কুলে পড়ছিলাম, লেখাপড়া শিখে চাকরী করে স্বাধীনভাবে জীবন কাটাতাম। আপনি আমাকে তা করতে দেন নি কেন?'

হেরম্ব মাথা নেড়ে বলল, 'তোর সহ্য হত না, সুপ্রিয়া।'

সুপ্রিয়া তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'কেন হত না? পাঁচ বছর এই বুনো দেশে পড়ে থাকা সহ্য হচ্ছে, পেট ভরাবার জন্য পরের দাসীবৃত্তি করছি, গরুবাছুরের সেবা করে আর ঘর গুছিয়ে জীবন কাটাচ্ছি,—ঝিমিয়ে পড়েছি একেবারে। নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়ালে আমার সহ্য হত না কেন?'

হেরম্ব বলল, 'দাসীবৃত্তি করছিস নাকি!'

সুপ্রিয়া তার সহিষ্ণুতা অক্ষুণ্ণ রেখে বলল, 'ধরতে গেলে কথাটা তাই দাঁড়ায় বৈকি!'

হেরম্ব আবার মাথা নেড়ে বলল, 'না, তা দাঁড়ায় না। দাঁড়ালেও

পৃথিবীশুদ্ধ সব মেয়ে হাসিমুখে যে কাজ করছে তার বিরুদ্ধে তোর নালিশ সাজে না। চাকরী করে স্বাধীনভাবে জীবন কাটানো তুই হয়তো খুব মজার ব্যাপার মনে করিস, আসলে কিন্তু তা নয়। আর্থিক পরাধীনতা স্বীকার করবার সাহস যে মেয়ের নেই তাকে কেউ ভালবাসে না। তাছাড়া,—' এইখানে ইজিচেয়ারের দুইদিকের পাটাতনে কনুয়ের ভর রেখে হেরম্ব সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ল, 'তাছাড়া স্বাধীনতা তোর সইত না। কতগুলি বিশ্রী কেলেঙ্কারি করে জীবনটা তুই মাটি করে ফেলতিস।'

সুপ্রিয়া সংক্ষেপে শুধু বলল, 'ইস্!'

'ইস্ নয়। ওই তোর প্রকৃতি। পনের বছর বয়সেই তুই একটু পেকে গিয়েছিলি, সুপ্রিয়া। বাইশ তেইশ বছর বয়সে মেয়েরা সারা জীবনের একনিষ্ঠতা অর্জ্জন করে, তোর মধ্যে সেটা পনের বছর বয়সে এসেছিল। তখনি তোর জীবনের দুটো পথ তুই একেবারে স্থির করে ফেলেছিলি। তার একটা হল লেখাপড়া শিখে স্বাধীন হয়ে থাকা, আর একটা—' হেরম্বকে একটু থামতে হল, '—অন্যটা এক অসম্ভব কল্পনা।'

সুপ্রিয়া আবার পলকহীন চোখে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করল, 'অসম্ভব কেন?'

হেরম্ব চেয়ারে কাত হয়ে এলিয়ে পড়ল।

'যা তুই, রান্নাঘর থেকে একবার ঘুরে আয়গে। ভাগ্।'

হেরম্বের আদেশে নয়, আতিথ্যের প্রয়োজনেই সুপ্রিয়াকে একসময়

রান্নাঘরে যেতে হল। মনে তার কঠিন আঘাত লেগেছে। সংসারে থাকতে হলে সংসারের কতকগুলি নিয়ম মেনে চলতে হয় এটা সুপ্রিয়া জানে এবং মানে। বিয়েই যখন তার করতে হল তখন মোটা মাইনের হাকিম অথবা অধ্যাপক অথবা পশারওয়ালা ডাক্তারের বদলে একজন ছোট দারোগার সঙ্গে তাকে গেঁথে দেওয়া হল কেন ভেবে তার কখনো আপশোষ হয় নি। বিয়ের ব্যাপারে বাধ্য হয়ে মানুষকে যে সব হিসাব করতে হয় সেদিক থেকে ধরলে কোন ছেলেমেয়েই সংসারে ঠকে না। এক বড় দারোগা যাচাই করতে এসে তাকে পছন্দ করে নি। তার নাকটা যে বোঁচা সে অপরাধও সেই বড় দারোগার নয়। একটি চোখা নাকের জন্য কষ্ট করে বড় দারোগা হয়ে তাকে বাতিল করে দেওয়াটা সুপ্রিয়া তার অন্যায় মনে করে না। তবু তার কিশোর বয়সের কল্পনাটি অসম্ভব কেন সুপ্রিয়া তার কোন সঙ্গত কারণ আবিষ্কার করতে পারে নি।

তার হতাশ বেদনা আজও তাই ফেনিল হয়ে আছে। চেনা মানুষ, জানা মানুষ, একান্ত আপনার মানুষ। যে নিয়মে অচেনা অজানা ছোট দারোগা তার স্বামী হল, ওই মানুষটির বেলা সে নিয়ম খাটবে কেন? ও খাটতে দেবে কেন? একি বিস্ময়কর অকারণ অন্যায় মানুষের! কেন, ভালবাসা বলে সংসারে কিছু নেই নাকি? সংসারের নিয়মে এর হিসাবটা গুঁজবার ফাঁক নেই নাকি?

সুপ্রিয়া ভাবে। এত ভাবে যে বছরে তার দু'তিনবার ফিট হয়।

সুপ্রিয়াকে ডালভাত রাঁধতে হয় না, একজন পাঁড়ে সিপাহী বেগার দেয়। সুপ্রিয়া রাঁধে মাছ তরকারী, রাঁধে ছানার ডালনা। গৃহকর্ম্মকে সে সত্যসত্যই এত ভালবেসেছে যে, মাছের ঝোলের আলু কুটতে বসেই

তার মনের আঘাত মিলিয়ে আসে। ওবেলা গাঁ থেকে দু'টো মুরগী আনবার মতলবটাও এসময় সে মনে মনে স্থির করে ফেলে।

রান্নার ফাঁকে একসময় হেরম্বকে শুনিয়ে আসে, 'আর কেউ হলে রান্নাঘরে গিয়ে আমার সঙ্গে গল্প করত।—ওমা, ঘুমে যে চোখ ঢুলছে!'

'ভারি ঘুম পাচ্ছে সুপ্রিয়া। সারারাত ঘুমোই নি।'

সুপ্রিয়া বলে 'তাই বলে, এখন এই সকালবেলা ঘুমোতে পাবেন না। সারাদিন শরীর বিশ্রী হয়ে থাকবে। আরেক কাপ চা পাঠাচ্ছি, খেয়ে চাঙ্গা হয়ে নিন, তারপর দুপুর বেলাটা পড়ে পড়ে যত ইচ্ছে ঘুমোবেন।'

দুপুর বেলা হেরম্বের সঙ্গে গল্প করবে, না কয়েকটা বিশেষ বিশেষ খাবার তৈরী করতে বসবে এতক্ষণ সুপ্রিয়া তা ঠিক করে উঠতে পারে নি। দুপুরে হেরম্বের ঘুমের প্রয়োজনে এ সমস্যার মীমাংসা হয়ে যাওয়ায় সে নিশ্চিন্ত হয়।

ভাবে, একা ফেলে রেখে কি আর খাবার করা যেত? পেটুক তো সহজ নয়! এ বেশ হল। ঘুমোবার সময়ের মধ্যেই হাত চালিয়ে সব করে ফেলব। তারপর গা ধুয়ে এসে আর কাজ নয়। শুধু গল্প।

গম্ভীর হেরম্বের সঙ্গে সে কি গল্প করবে সে-ই জানে।

হেরম্বের জন্য আবার চা করতে গিয়ে সে ফিরে আসে।

'একটু ব্র্যাণ্ডি খাবেন? শরীরের জড়তা কেটে যাবে।'

সে তামাসা করছে ভেবে হেরম্ব একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বলে, 'ব্র্যাণ্ডি! ব্র্যাণ্ডি তুই পাবি কোথায়?'

'আছে। উনি খান যে!'

হেরম্ব অবাক হয়ে বলে, 'অশোক মদ খায়?'

সুপ্রিয়া হাসে।

'নেশা করবার জন্যে কি আর খায়? শরীর ভাল নয় বলে ওষুধের মত খায়। আমিও ক'দিন খেয়েছি। খেলে এমন চনচনে লাগে শরীর যে মনে হয় ওজন অর্দ্ধেক হালকা হয়ে গেছে। একদিন,—রাগ করবেন না তো?—একদিন অনেকটা খেয়ে ফেলেছিলাম। নেশায় শেষে অন্ধকার দেখতে লাগলাম!'

'তোর সব বিষয়েই বাড়াবাড়ি সুপ্রিয়া। নেশায় কেউ অন্ধকার ছাখে!'

'ছাখে না? আমার যেরকম ভয় হয়েছিল, আপনার হলে বুঝতেন।' চাবির গোছা হাতে নিয়ে সুপ্রিয়া একটা চাবি বেছে ঠিক করে, 'বলুন, চা খাবেন, না ব্র্যাণ্ডি খাবেন। আলমারিতে দু' বোতল আছে। কি রঙ্! দেখলে খেতে লোভ হয়!'

মাতাল হবার জন্য স্বামী মদ খায় না বলে এটা সুপ্রিয়ার কাছে এখনও হাসির ব্যাপার। কিন্তু হেরম্বের মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ তার হাসি ডুবে যায়।

সে ভয়ে ভয়ে বলে, 'রাগ করলেন?' হেরম্বের রাত-জাগা লাল চোখ এ প্রশ্নে তার দিকে ফিরে আসে না, স্কুলের ছেলের সামনে কড়া মাষ্টারের মত তার গাম্ভীর্য্য কোথাও একটু টোল খায় না। রূঢ় নীরস কণ্ঠে সে সংক্ষেপে বলে, 'না।'

সুপ্রিয়ার কানে কথাটা ধমকের মত শোনায়। নিজেকে তার হঠাৎ অসহায়, বিপন্ন মনে হয়।

'কি হল, বলুন। আপনাকে বলতে হবে। আমি ব্র্যাণ্ডি খেয়েছি লে? সত্যি বলছি একদিন শুধু সখ করে একটুখানি—'

হেরম্ব বলে, 'ছেলেমানুষের মত কথা বলিসনে, সুপ্রিয়া। তোর নেক বয়স হয়েছে।'

সুপ্রিয়া দু'পা সামনে এগিয়ে যায়। হেরম্বের একটা হাত শক্ত করে চেপে ধরে বলে, 'ছেলেমানুষের মত কথা আমি বলি নি। আপনিই আমায় ছেলেমানুষ করে রাখছেন।—এসব চলবে না, তাকান, তাকান, তাকান আমার দিকে। আমার দু'বছর বিয়ে হয়েছে, আমি কচি খুকী নই যে, হঠাৎ কেন এত রেগে গেলেন শুনতে পাব না।'

হেরম্ব তার চোখের দিকে তাকাল না। তেমনি ভাবে বসে তেমনি কড়া সুরে বলল, 'শুনে কি হবে? তুই কি বুঝবি? তোর মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু তুই এমন আস্তে আস্তে নিজের র্বনাশের ব্যবস্থা করছিস কেন? আমি তোকে ভাল উপায় বলে দিচ্ছি। রাত্রে একদিন অশোককে ঘুমের ওষুধ খাইয়ে ঘরের চালে াগুন লাগিয়ে দিস্।'

অনেকক্ষণ স্তব্ধ বিহ্বল হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে কথা বলার চেষ্টায় ব্যর্থ য়ে সুপ্রিয়া কেঁদে ফেলে রান্নাঘরে চলে গেল। তার মনে হতে লাগল, বশেষ ভাবে তাকে আঘাত করবার জন্যই হেরম্ব এতকাল পরে তার াড়ীতে অতিথি হয়েছে। দু'দিনের নোটিশ দিয়ে ওর আকস্মিক াবির্ভাবটা গভীর ষড়যন্ত্রের ব্যাপার। পাঁচ বছরে তার মনের অবস্থা

কিরকম দাঁড়িয়েছে, আগে তার একটা ধারণা করে নিয়ে তাকে আঘাত দিয়ে অপমান করে তার কল্পনা ও স্বপ্নের অবশিষ্টটুকু মুছে নেবার উদ্দেশ্যেই হেরম্ব তার বাড়ীতে পদার্পণ করেছে। তাকে ও শাসন করবে, সঙ্কীর্ণ ও সংক্ষিপ্ত একটি বাগানে তার মূল বিস্তার করা দরকার বলে তার সব বাহুল্য ডালপালা ছেঁটে ফেলবে, এমন একটি শাখা রেখে যাবে না, যেখানে সে দু'টি অনাবশ্যক ফুল ফোটাতে পারে।

ছোট দারোগার সঙ্গে হেরম্ব তার বিয়ে দিয়েছিল। আজ একদিনে সে তাকে ছোট দারোগারই বৌ তৈরী করে দিয়ে চলে যাবে।

এবার আর কাজে সুপ্রিয়া সহজে মন বসাতে পারে না, মাছের ঝোলে আলুর দমের গোটা গোটা আলু ছেড়ে খুন্তি দিয়ে তরকারীর মত ঘুঁটে দেয়। নুন দেওয়া হয়েছে কিনা মনে করতে না পেরে খুন্তিটা উঁচু করে ঠাণ্ডা হবার সময় না দিয়েই এক ফোঁটা তপ্ত ঝোল জিভে ফেলে দেয়। গরমের জ্বালাটাই সে টের পায়, নুনের স্বাদ পায় না।

ডেকে বলে, 'ও পাঁড়ে, দ্যাখতো নিমক দিয়া কি নেই ?' এবং মাছের ঝোল মুখে করা দূরে থাক, পাঁড়ে তার ছোঁয়া পর্য্যন্ত খায় না স্মরণ করে তার রাগ হয়।

'যাও, তুম্ বাহার চলা যাও।'

ভাবে, 'হয়েছে। আজ আর আমি রেঁধে খাইয়েছি।'

তার মনের মধ্যে হেরম্বের কথাটা পাক খেয়ে বেড়ায়। শরীর খারাপ বলে অশোক ওষুধের মত মদ খেলে তার অপরাধটা কোনখানে হয় সে ভেবে পায় না। আজকের ওষুধ কাল অশোকের নেশায় দাঁড়িয়ে গেলেও সে ঠেকাবে কি করে ? বারণ সে করতে পারে। একবার কেন

দশবার বারণ করতে পারে। দরকার হলে পায়ে ধরে কাঁদাকাটা করতেও তার আপত্তি নেই। কিন্তু চাকরীর জোরে বিয়ে-করা বৌএর কথা শুনছে কে? সংসারে সকলে যদি তার কথামতই চলত তবে আর ভাবনা ছিল কিসের! মদে আসক্তি জন্মে যাবার আশঙ্কা অশোক হেসেই উড়িয়ে দেবে। বলবে, 'ক্ষেপেছ? আমার ওটুকু মনের জোর নেই? এ বোতল দুটো শেষ হলে হয়ত আর কিনবার দরকার হবে না।' বলবে, 'কতগুলো টাকা! থাকলে পোষ্টাপিসে জমত। সাধ করে কেউ অত দামী পদার্থ কেনে!'

সে জবাব দেবে কি? স্বামীর মনের জোরে সন্দেহ প্রকাশ করবে? তার স্বাস্থ্য ভাল করার দরকার নেই বলে আব্দার ধরবে? অশোক ধমকে উঠলে তার মুখখানা হেরম্ব যেন তখন দেখে যায়!

গরমে, আগুনের তাতে, সুপ্রিয়া এতক্ষণে ঘেমে উঠেছে। উঠানে চন্‌চনে রোদ। একটু বাতাস গায়ে লাগবার জন্য দরজার কাছে সরে গিয়ে সুপ্রিয়া দেখতে পেল, হেরম্ব শোবার ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। দু'জনের মাঝে উঠানের ব্যবধান ভরে ঝাঁঝালো কড়া রোদটা সুপ্রিয়ার কাছে রূপকের মত ঠেকল।

বারান্দা থেকেই হেরম্ব বলল, 'এত গরমে তোর না রাঁধলেও চলবে, সুপ্রিয়া। পাঁড়েকে ছেড়ে দিয়ে চলে আয়, যা পারে ওই করবে।'

সুপ্রিয়া কথা বলল না। আঁচলে মুখ মুছে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

হেরম্ব বলল, 'আমাকে চা দিলি না যে?'

'এত গরমে একশোবার চা খেতে হবে না।'

'এক গেলাস জল দে তবে।'

হেরম্বকে তৃষার্ত্ত জেনে সুপ্রিয়ার সেবাবৃত্তি জাগ্রত হয়ে উঠল।

'সরবৎ করে দেব? লেবুর সরবৎ?'

হেরম্ব আগ্রহ জানিয়ে বলল, 'দে, তাই দে।'

আহত, উত্তপ্ত ও ঘর্ম্মাক্ত সুপ্রিয়ার হাত থেকে সরবতের গ্লাস নেবার সময় একমুহূর্ত্তের জন্য হেরম্বের মনে হল হয়ত সত্যসত্যই মেয়েদের মঙ্গলের ব্যবস্থা করতে গিয়ে পুরুষেরা গোড়াতেই কোথাও একটা গলদ বাধিয়ে বসে আছে, যে জন্য ওদের মনের শৈশব কোনদিনই ঘুচতে চায় না। ঘুণ যদি ধরে তো একেবারে কাঁচা মনেই ধরে, নইলে ওরা আজন্ম শিশু। জীবন-সাগরের তীরে বালি খুঁড়ে পুকুর তৈরী করে ওরা খুসী থাকবে, সমুদ্রের সঙ্গে তাদের সে কীর্ত্তির তুলনা কখনো করবে না। ডাবের জলে ডাবের শাঁসে জগতের ক্ষুধাতৃষ্ণা দূর হয় চিরদিন এই থাকবে ওদের ধারণা, জগতের ক্ষুধাও ওরা বুঝবে না, তৃষ্ণার প্রকৃতিও জানবে না।

সরবৎ পান করে হেরম্ব বলল, 'কাল ফিট হয়েছিল, আজ আবার রাঁধতে গেলি কেন?'

'বাড়ীতে অতিথি, রাঁধব না? অতিথি খাবে কি?'

'অতিথি দইচিঁড়ে দিয়ে ফলার করবে।'

'অতিথির অত দরদ দেখিয়ে কাজ নেই!'

সুপ্রিয়ার মুখের মেঘ আস্তে আস্তে কেটে যাচ্ছিল। সে ভাবতে আরম্ভ করেছিল যে, হেরম্ব খেয়ালী মানুষ, মনের খেয়ালে ও যদি একটা অদ্ভুত কিছু করতে চায়, রাগ করে আর লাভ কি হবে? যে উদ্দেশ্যে যে মনোভাব নিয়েই ও এসে থাক, সে বিনা প্রতিবাদে ওকে গ্রহণ

করবে। নিজের সুখ দুঃখ মান অভিমানের কথাটা একেবারেই ভাববে না। বড় ভাইএর মত ও যদি তাকে শাসন করে, ছোট বোনের মত সে নীরবে শাসিত হবে। ভ্রান্ত কল্যাণকামীর মত ও যদি তার মনে ব্যথা দেয়, মুখ বুঁজে সে ব্যথিত হবে। ও যদি তার চোখের জল দেখতে চায়, দু'চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল ঢেলে ওকে সে চোখের জল দেখাবে। স্বপ্নহীন মাধুর্য্যহীন রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে তাকে যদি আকণ্ঠ নিমজ্জিত দেখতে চায়, পাকা গিন্নীর মত ব্যবহার করে ওকে সে তাক লাগিয়ে দেবে।

হেরম্বের নিদ্রালস প্রভাতটি অতঃপর সুপ্রিয়ার এই গোপন প্রতিজ্ঞার ফলাফলে ক্ষুব্ধ ও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। সহসা সুপ্রিয়া যেন তার কাছে একটা দুর্ব্বোধ্য রহস্যের আবরণ নিয়েছে। বিদায়কামী কচের কাছে দেবযানীর অভিশাপের মত সুপ্রিয়ার আকস্মিক ও অভিনব সহজ হাসি-খুসীর ভাবটা হেরম্বের কাছে দুর্ব্বলের বিশ্রী প্রতিশোধ নেওয়ার মত ঠেকতে লাগল। মনে হল, ইঁদারার জলের মত ঠাণ্ডা মেয়েটা হঠাৎ বরফ হয়ে গেছে। স্নিগ্ধতা দেখালে আরও জমাট বাঁধছে, রূঢ়তার উত্তাপে বিনা বাক্যব্যয়ে গলতে আরম্ভ করে দিচ্ছে। কিন্তু গ্রহণ করছে না কিছুই।

সুপ্রিয়ার রান্না শেষ হতে বারটা বাজল। ফিট হতে সুরু হওয়ার পর থেকে তার চোখের কোলে নিষ্প্রভ কাজলের মত একটা কালিমার ছাপ পড়েছিল। এই আবেষ্টনীর মধ্যে তার চোখ দু'টি আজকাল আরও

বেশী উজ্জ্বল দেখায়। এখন, এই গরমে এতক্ষণ কাঠের উনানে রান্না করার ফলে তার সমস্ত মুখ মলিন নিরুজ্জ্বল হয়ে গেছে। হেরম্ব আর একবার স্নান করবে কিনা জিজ্ঞাসা করতে এলে তার মুখের দিকে তাকিয়ে হেরম্ব ব্যথিত হল। একধার থেকে কেবল রান্না করে যাওয়ার পাগলামী মেয়েদের কেন আসে হেরম্বের তা অজানা নয়। আরও অনেককেই সে এ নেশায় মেতে থাকতে দেখেছে। সুপ্রিয়ার মত তাদেরও এমনি রান্নার ঝোঁক চাপে, রেঁধে রেঁধে আধমরা হয়ে তারা খুসী হয়।

অথচ তাদের সঙ্গে, যারা ভাববার উপযুক্ত মন থেকে বঞ্চিত, সুপ্রিয়ার একটা অতিবড় মৌলিক পার্থক্য আছে। ওর এত রান্না করাকে হেরম্ব কোনমতেই সমর্থন করতে পারল না।

বারান্দায় দাঁড়ালে বাড়ীর প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে বহুদূর অবধি প্রান্তর চোখে পড়ে। মাঠ থেকে এখন আগুনের হলকা উঠছে। খানিক তাকিয়ে থাকলে চোখে ধাঁধা লেগে যায়।

হেরম্ব বলল, 'বার বার স্নান করিয়ে আমাকে ঠাণ্ডা করতে চাস, তুই যে গরমে গলে গেলি নিজে ?'

সুপ্রিয়া এখনো হাসল, 'গলে গেলাম ? ননীর পুতুল নাকি !'

হেরম্ব গম্ভীর হয়ে বলল, 'হাসিস নে। তুই কি বলবি জানি, তবু তোকে বলে রাখি, শরীর ভাল রাখার চেয়ে বড় কাজ মানুষের নেই। শরীর ভাল না থাকলে মানুষ ভাবুক হয়, দুঃখ বেদনা কল্পনা করে, ভাবে জীবনটা শুধু ফাঁকি। বদহজম আর ভালবাসার লক্ষণগুলি যে একরকম তা বোধ হয় তুই জানিস নে ?—'

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুপ্রিয়া আনমনে হেরম্বের মুখে স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্পর্কীয় উপদেশ শুনল। কিন্তু তার একটি কথাতেও সায় দিল না।

সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত ঘুমিয়ে উঠে হেরম্ব দেখল আয়নার সামনে সুপ্রিয়া চুলবাঁধা শেষ করে এনেছে। সে টের পেল, সুপ্রিয়ার একটি আশা সে পূর্ণ করেছে। প্রসাধন শেষ হবার আগে ঘুম ভেঙ্গে সে তাকে দেখবে সুপ্রিয়ার এই কামনা হেরম্বকে রীতিমত বিস্মিত করে দিল।

'চুলের জট ছাড়াতে কান্না আসছিল, হেরম্ববাবু। কপাল ভাল, তাই একটু আগে আপনার ঘুম ভাঙ্গে নি। তখন আমার মুখ দেখলে আর একমিনিট এ বাড়ীতে থাকতে রাজী হতেন না।'

দু'হাতের তালু একত্র করে মাথার পিছনে রেখে হেরম্ব বলল, 'ডেকে তোলা উচিত ছিল। চুলের জট ছাড়াবার সময় তোদের মুখভঙ্গী দেখতে আমার বড় ভাল লাগে সুপ্রিয়া।'

'সৃষ্টিছাড়া ভাল লাগা নিয়েই তো কারবার আপনার।'

সুপ্রিয়া তাড়াতাড়ি খোঁপা বেঁধে ফেলল। আয়নায় একবার পরীক্ষকের দৃষ্টিতে নিজের মুখখানা দেখে নিয়ে প্রসাধনে যবনিকা-পাত করল।

বলল, 'আর ঘরে কেন? বাইরে বসে চা খাবেন চলুন। এর মধ্যে চারিদিক জুড়িয়ে গিয়ে ঝির ঝির বাতাস বইছে।'

'রাত্রে এখানে ঠাণ্ডা পড়ে, না?'

সুপ্রিয়া হেসে মাথা নাড়ল, 'গরম কমে, ঠাণ্ডা পড়ে না। তবে খুব

বাতাস বয়,—ওই যে ঝাউ গাছগুলি দেখছেন? সমস্ত রাত সাঁ সাঁ করে ডাকবে, শুনতে পাবেন।'

হেরম্ব ক্ষণিকের জন্য মুগ্ধ হয়ে গেল।

'ঝাউ গাছের কাছ থেকে বেড়িয়ে আসি চল্, সুপ্রিয়া।'

'যাবেন?' সুপ্রিয়া এক মুহূর্তে উত্তেজিত হয়ে উঠল,—'তবে উঠুন, উঠে শীগগির তৈরী হয়ে নিন। আমি চট্ করে চা করে ফেলছি। উঠুন না!'

হেরম্ব প্রশান্তভাবে শুয়ে রইল। উঠবার তার কোন তাড়াই আর দেখা গেল না। আলস্যের অড়ালে আশ্রয় নিয়ে স্তিমিত চোখে তাকিয়ে সে বলল, 'আলসেমি লাগছে, সুপ্রিয়া।'

সুপ্রিয়া ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, 'যাবেন বললেন যে?'

'যাব বললাম বটে কিন্তু তারপর ভেবে দেখলাম, ঝাউগাছ দূর থেকেই ভাল দেখায়।'

'অন্যদিকে চলুন তবে? চলুন দু'জনে মাঠে খানিকটা হেঁটে আসি। যাবেন বলেছেন যখন, আপনাকে যেতে হবেই, হেরম্ববাবু। উঠুন। দশ গোণার মধ্যে না উঠলে হাত ধরে টেনে তুলে দেব।'

হাত ধরে টেনে তোলার ইচ্ছাটা সুপ্রিয়ার আকস্মিক নয়, হাত ধরে টেনে তোলবার সুযোগটা হেরম্ব তাকে দেবে এ আশাও সুপ্রিয়া করছিল। রহস্যের ছলে এ তো তুচ্ছ, সামান্য দান! কিন্তু এটুকু বুঝবার মত নিবিড় মনোযোগ সুপ্রিয়ার প্রতি হেরম্ব বজায় রাখতে পারে নি। সুপ্রিয়ার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সে বিছানায় উঠে বসল।

সুপ্রিয়াকে চেষ্টা করে চোখের জল নিবারণ করতে হল। তার যে

অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে পদে পদে ব্যথা না পেয়ে তার উপায় ছিল না। গোধূলি-লগ্নে নির্জ্জন তরঙ্গায়িত প্রান্তরে তার সঙ্গে পাশাপাশি বেড়াতে যাওয়া হেরম্বের কাম্য নয় সন্দেহ করে, কাম্য হলেও একটা তুচ্ছ খেয়ালের বশে বেড়াতে যাওয়ার উৎসাহ সে সত্যসত্যই দমন করে ফেলেছে নিশ্চিত জেনে, সুপ্রিয়া কম আহত হয় নি। তবু, হৃদয়কে হেরম্ব জোর করে নিয়ন্ত্রিত করছে এই ধারণা সুপ্রিয়াকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। কিন্তু সে যে ছুতো করে হেরম্বের হাত ধরে টেনে তুলতে চায় এটা হেরম্ব খেয়াল পর্য্যন্ত করতে পারল না দেখে নিজেকে তার অপমানিত ও অবহেলিত মনে হতে লাগল। সে যেন বুঝতে পারল, হেরম্বের মন থেকে সে মিলিয়ে গেছে। একটা কর্ত্তব্য-বুদ্ধির, একটা মোটা সাংসারিক প্রতিকারস্পৃহার আশ্রয় ছাড়া হেরম্বের কোন মনোবৃত্তিই আর তাকে নিয়ে ব্যাপৃত হয়ে নেই।

শেষ পর্য্যন্ত মাঠে হেরম্ব তাকে বেড়াতে নিয়ে গেল. কিন্তু বেড়ানো উপভোগ করার ক্ষমতা সুপ্রিয়ার আর ছিল না। সমস্ত দুপুরটা প্রকৃতির গ্রীষ্ম আর উনানের ধোঁয়া সহ্য করে সে কল্পনার জাল বুনেছে। ভেবেছে, পথের গ্লানি কেটে গেলে বিকালে শত অনিচ্ছাতেও নিজেকে ও প্রকাশ না করে পারবে না। নিজের অজ্ঞাতেই ও কত কথা বলবে, কত ভুল করবে, কত সময় অন্যমনে আমার দিকে চাইবে। ও টেরও পাবে না ওর কোন কথাটি কুড়িয়ে, কোন ভুলটি ধরে, কোন চাউনির মানে বুঝে ওকে আমি চিনে ফেলছি। সুপ্রিয়া আরও ভেবেছে, আমি এখন বড় হয়েছি। পাঁচ বছর ধরে ভেবে ভেবে আমি বুঝতে পেরেছি পৃথিবীতে একটা ব্যাপার হয় না। বেশ মোটা করে ভালবাসা বুঝিয়ে না দিলে—

সারা দুপুর সুপ্রিয়া এই কথা ভেবেছে। ভেবেছে আমার এই শরীরটা এত সুন্দর নয় যে, শুধু চোখেদেখার সান্নিধ্যে কেউ খুসী হয়। ওর মনের বাজে খেয়ালটা নষ্ট করে দিতে হলে আমাকে লজ্জা একটু কমাতে হবে। ওর কি, কাল চলে গেলে মস্ত একটা ত্যাগ করার গৌরব নিয়েই বাকী জীবনটা দিব্যি কাটিয়ে দেবে। সর্ব্বনাশ আমার। কাব্য নিয়ে থাকলে আমার চলবে কেন? আমি যে একটা দিনের জন্য সুখ পেলাম না, সারাদিন আমার যে কিছু ভাল লাগে না, কিছুই ভাল লাগে না—

কাল ও জন্মের মত চলে গেলে বেঁচে থেকে আমি কি করব? এতদিন আশায় আশায় কাটিয়েও যে কষ্টটা আমি পেয়েছি ও তার কি বুঝবে! ছাই সংসার, ছাই ভালমন্দ! ছাই আমার মঙ্গল অমঙ্গল! একজনের অদর্শন সইতে না পেরে আমার যদি শুধু অসহ্য যন্ত্রণাই হতে থাকে, জগতে কিসে তবে আমার মঙ্গল হওয়া সম্ভব শুনি? পাঁচ বছর পরীক্ষা করেই তো বোঝা গেল এসব আমার পোষাবে না। কলের মত হাতপা নেড়েছি, শুয়েছি, বসেছি, হেসেছি পর্য্যন্ত; কিন্তু আমি তো জানি কি করে এতকাল আমার কেটেছে, দিনের মধ্যে কতবার আমার মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে সাধ গিয়েছে।

না বাবু, এমন করে একটা দিনও আমি আর থাকতে পারব না।

কড়াইএ ফেনার তলে অদৃশ্যপ্রায় রসগোল্লাগুলির দিকে তাকিয়ে ভেবেছে, আমি ওর সঙ্গে চলে যাব। কিছুতেই আমাকে ফেলে রেখে যেতে দেব না। বলব আপনার জন্য না হোক্, আমার জন্যই আমাকে

নিয়ে চলুন। না নিয়ে গেলে আমি যে জীবনে প্রথমবার ওর অবাধ্য হয়ে বিষ খেয়ে মরে যাব একথাটাও ওকে আমি জানিয়ে দেব।

সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে হেরম্বের সঙ্গে শুকনো ঘাসে ঢাকা মাঠে হাঁটতে হাঁটতে সুপ্রিয়া তার এই প্রতিজ্ঞা স্মরণ করে মূক হয়ে গিয়েছিল। এই নিস্তেজ আত্মবিস্মৃত মানুষটির সঙ্গে গিয়ে তার লাভ কি হবে? ওতো ভুলে গিয়েছে। ও আর না চায় সুপ্রিয়ার দেহ, না চায় তার মন। সংসারের টানে সুপ্রিয়া ওর কাছ থেকে ভেসে গিয়েছে। ওর আর ইচ্ছা নয় সাঁতরে সে ফিরে আসে।

হে ভগবান! জগতে এমন ব্যাপার ঘটে কি করে!

মাটির স্থির তরঙ্গের মত একটা উঁচু জায়গায় পৌঁছে সুপ্রিয়া অস্ফুট স্বরে বলল, 'একটু বসি।'

থানার মিটমিটে আলোটির দিকে মুখ করে তারা বসল।

সুপ্রিয়া হঠাৎ বলল, 'বৌএর কথা বলতে আপনার কি কষ্ট হয়?

হেরম্ব পাশবিক নিষ্ঠুরতার সঙ্গে জবাব দিল, 'না।'

'বৌ গলায় দড়ি দিয়েছিল কেন?'

'জানি না।'

চারিদিকে অন্ধকার দ্রুত গাঢ় হয়ে আসছিল। রূপাইকুড়া গ্রামে দু'একটি আলোকবিন্দু সঞ্চরণ করছে। বছরে দু'বার আকাশে তারা-খসার মরসুম আসে, এখন আর শীতকালে। আকাশে অর্দ্ধেক তারা উঠবার আগেই থানার পিছনে একটা তারা খসে পড়ল।

হেরম্বের সংক্ষিপ্ত জবাবটি মনে মনে খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে সুপ্রিয়া বলল, 'দাদার চিঠিতে যখন জানলাম বৌ ওরকম ভাবে মরেছে

প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারি নি। জগতে এত লোক থাকতে আপনার বৌ গলায় দড়ি দেবে এ যেন ভাবাও যায় না।'

'আমার মত লোকের বৌএরাই গলায় দড়ি দেয়, সুপ্রিয়া। আমি হলাম জগতের সেরা পাষণ্ড। তুই ছেলেমানুষ—'

'আবার ও কথা!'

হেরম্ব এবার একটু শব্দ করেই হাসল।

'ছেলেমানুষ বললে তোরা রাগ করিস, এদিকে বয়স কমবার চেষ্টার কামাই নেই। তোরা—'

'এসব বিশ্রী পচা ঠাট্টা শুনতে ভাল লাগছে না, হেরম্ববাবু '

'সেটা আশ্চর্য্য নয় সুপ্রিয়া।' হেরম্ব একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে সুপ্রিয়া বলল, 'তারপর বলুন।'

হেরম্ব বলল, 'আমি জগতের সেরা পাষণ্ড, একথা স্বীকার করার পর আর কি বলার থাকে মানুষের? গলায় দড়ি না দিলে উমা ক্ষেপে যেত প্রকৃত পক্ষে, একটু ক্ষেপে গিয়েই সে গলায় দড়ি দিয়েছিল।'

সুপ্রিয়া রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার কথা শুনে?'

'তোর কথা আমি ওকে কিছুই বলি নি।'

'তবে? কি জন্য তবে ও অমন কাজ করল। আমি ওর সম্বন্ধে খোঁজ নিয়েছি, হেরম্ববাবু। দাদা লিখেছিল, অমন শান্ত ভাল মেয়ে আর হয় না। শুধু শুধু সে অমন কাজ করতে যাবে কেন?'

'তোর দাদা জগতের সব খবর রাখে।'

'আশ্চর্য্য মানুষ আপনি!' সুপ্রিয়া আর কথা খুঁজে পেল না। হেরম্বের কাছে কথার অভাব তার চিরন্তন। হেরম্বের কাছে এলে মনের

কথা ভাষায় প্রকাশ করার প্রয়োজন তার যেন শেষ হয়ে যায়। হেরম্ব যেন তার ভাবনা শুনতে পাবে। কাছে বসে ভেবে গেলেই হল। প্রথম প্রেমে-পড়া মেয়েদের এই ভ্রান্ত অবস্থাটি সুপ্রিয়া এখনো একেবারে কাটিয়ে উঠতে পারে নি। হাজার প্রশ্নে মন ভারি করে সে তাই নীরবে বসে রইল।

উমা তারি জন্য আত্মহত্যা করেছে এই ছিল এতকাল তার ধারণা। স্বামী মনপ্রাণ দিয়ে আর একজনকে ভালবাসে—তাকে ভালবাসে, এটা বেচারীর সহ্য হয় নি। আরেকজনের, তার, প্রেমে তলিয়ে যাওয়া স্বামীকে ছেড়ে সে তাই মৃত্যুর অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছে। এই ধারণা হেরম্বের কথায় ভেঙ্গে যেতে সুপ্রিয়া বিহ্বল হয়ে গেল। হেরম্ব যে তাকে ভালবাসে উমার আত্মহত্যা ছিল তার প্রমাণ। মৃত্যুর মত অখণ্ড অপরিবর্ত্তনীয় নিঃসংশয় প্রমাণ। এই প্রমাণের বাঁধ অপসারিত হয়ে যেতে যে সন্দেহ ও আত্মগ্লানির বন্যা এল, সুপ্রিয়া তাতে আর থই পেল না। তার মনে হল, সারাদিনের ব্যর্থ চেষ্টার পর এতক্ষণে হেরম্ব তাকে আশ্রয়চ্যুত করে দুঃখ ও হতাশার স্রোতে ভাসিয়ে দিতে পেরেছে। জীবনে আর তার কিছু রইল না। এতদিনের ভুল আর বাকী দিনগুলির জন্য সেই ভুলের উপলব্ধি—এই দুটি পরিচ্ছেদই তার জীবনী। যে জীবনকে সে মহাকাব্য বলে জেনে রেখেছিল সে একটা সাধারণ কবিতাও নয়।

থানায় পৌঁছে তারা দেখল, অশোক ফিরে এসে স্নান সমাপ্ত করে বিশ্রাম করছে।

হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল, 'কতক্ষণ ফিরেছ, অশোক?'

'আপনারা বেরিয়ে যাবার একটু পরেই।'

সুপ্রিয়া অনুযোগ দিয়ে বলল, 'আমায় ডেকে পাঠালে না কেন? আমরা ওই সামনের মাঠে ছিলাম। এখান থেকে দেখা যায়।'

অশোক হেসে বলল, 'কি বলে ডেকে পাঠাতাম? আমি বাড়ী এসেছি, তুমি চট্ করে বাড়ী চলে এসো? তার চেয়ে দিব্যি স্নানটান করে বিশ্রাম করছিলাম।—গা হাত, জানো গো, ব্যথা হয়ে গেছে।'

'আহা, তা হবে না! সারাটা দিন যে ঘোড়ার পিঠে কাটল! খাওনি কিছু? জানি খাওনি, আমি এসে না দিলে খাবে—'

অশোক অপরাধীর মত বলল, 'খেয়েছি, সুপ্রিয়া। এমন খিদে পেয়েছিল—'

হেরম্ব লক্ষ্য করল, সুপ্রিয়ার মুখ প্রথমে একটু কালো হয়ে শেষে লালিমায় পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল। চাকরি ছাড়া স্বামীকে আর সব বিষয়েই সে যে তার মুখাপেক্ষী করে রেখেছে হেরম্বের কাছে তা প্রকাশ

হয়ে গেল। একদিন খুব ক্ষুধার সময় তার অপেক্ষায় বসে না থেকে পেট ভরালে অশোকের যদি অপরাধ হয়, স্ত্রীর কাছে সে অনেকটা শিশুত্বই অর্জ্জন করেছে বলতে হবে। আগাগোড়া স্ত্রীর মন যোগানোর এই আদর্শ বজায় রেখে অশোক দিন কাটায় কি করে ভেবে হেরম্ব অবাক হয়ে রইল।

সুপ্রিয়া বলল, 'কি খেলে?'

'তুমি যা যা করেছ খুঁজে পেতে সব একটা করে খেয়েছি।'

'তবে তো খুব খেয়েছ!'—বলে সুপ্রিয়া জেরা আরম্ভ করল, 'সন্দেশ খেয়েছ? খেয়েছ। না খেলেই ভাল হত, সন্দেশে তোমার অম্বল হয়। রসগোল্লা খেয়েছ? একটা খেলে কেন মোটে? আর দুটো খেলেই হত। আজ ঠিক স্পঞ্জ হয় নি? মালপো খেয়েছ? কেন খেলে? যা সয় না তা খাবার দরকার! এই জন্যেই তো তোমাকে আমি নিজের হাতে খেতে দিই। লোভে পড়ে যা-তা খাবে, শেষে বলবে সোডা দাও।... সরভাজা খাও নি?'

হেরম্ব অশোককে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার নাকি স্বাস্থ্য খুব খারাপ হয়ে পড়েছে, অশোক? শরীর ভাল করার জন্য ব্র্যাণ্ডি খাও?'

অশোক চমকে বলল, 'আমি? কই না, খাই না তো! কে বললে খাই?'

হেরম্ব বলল, 'কেউ না, এমনি কথাটা জিজ্ঞাসা করলাম।'

সুপ্রিয়া বলল, 'নাই বা করতেন কথাটা জিজ্ঞাসা?'

কিন্তু এ প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য তার সফল হল না। অনায়াসে

প্রসঙ্গান্তর এনে হেরম্ব তার কথাটা চাপা দিয়ে দিল। অশোককে সে জিজ্ঞাসা করল, 'খুনী ধরতে গিয়েছিলে শুনলাম? কোথায় খুন হল?'

'বরকাপাশীতে।' অশোক সংক্ষেপে জবাব দিল।

'ধরলে?'

'ধরেছি। বড় ভুগিয়েছে ব্যাটা। এ গাঁ থেকে সে গাঁ—হয়রান করে মেরেছে। শেষে একটা ঝোপের মধ্যে কোণঠাসা করে ধরতে ধরা দিলে।' অশোক একটু উৎসাহিত হয়ে উঠল। নিজের ব্যবসার কথা বলতে পেলে সকলেই খুসী হয়। 'দা নিয়ে খুন করতে উঠেছিল। জমাদার জাপ্টে না ধরলে আজ একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যেত। ব্যাটা কি যোয়ান!'

সুপ্রিয়ার চোখের দিকে একবার স্পষ্টভাবে তাকিয়ে হেরম্ব বলল, 'কাকে খুন করেছে?'

'বৌকে। চিরকাল যা হয়ে থাকে,—অসময়ে স্বামী বাড়ী ফিরল, নাভার গেল পালিয়ে, বৌ হল খুন। গলাটা একেবারে দুফাঁক করেও ব্যাটার তৃপ্তি হয় নি। সমস্ত শরীর দা দিয়ে কুপিয়েছে।'

সুপ্রিয়া শিউরে বলল, 'মাগো!'

খুনীটা তার স্বামীকে দা নিয়ে কাটতে উঠেছিল শুনে সুপ্রিয়া শব্দ করে নি স্মরণ করে হেরম্ব একটু ক্ষুব্ধ হল।

'ফাঁসি হবে?'

অশোক বলল, 'না! যথেষ্ট প্রোভোকেশন ছিল।'

সুপ্রিয়া অস্থির হয়ে বলল, 'কি আলোচনা আরম্ভ করলে? ওসব

কথা থাক বাপু, ভাল লাগে না। খুন, জখম, ফাঁসি—বলার কি আর কথা নেই ?'

হেরম্ব হেসে বলল, 'তুই দারোগার বৌ, খুন জখম ভাল না লাগলে তোর চলবে কেন সুপ্রিয়া ?'

'দারোগার বৌ হয়ে কি অপরাধ করেছি ? আমি তো দারোগা নই।'

'কি জানি কি অপরাধ করেছিস। আমি বলতে পারব না। অশোককে জিজ্ঞাসা কর। খুন জখম ভাল না লাগলে পাছে অশোককেও তোর ভাল না লাগে এই ভেবে বলছিলাম সংসারের রাহাজানির ব্যাপারগুলোকে ভালবাসতে শেখ্। তুই দাঁড়িয়ে রইলি কেন বল্ তো, সুপ্রিয়া ? অশোকের সামনে তুই দাঁড়িয়ে থাকিস নাকি ? এতো ভাল কথা নয়। হেঁটে এসে তোর নিশ্চয় পা ব্যথা করছে। দাও হে অশোক, ওকে বসবার অনুমতি দাও। ভাল করে বসে একটা গল্প শোন, সুপ্রিয়া।'

'শুনব না গল্প।'

'আহা শোন না। অশোক ওকে শুনতে বল ত।'

'শুনব না, শুনব না, শুনব না। হল ? গল্প শুনব—আমি কচি খুকী নই।'

হেরম্ব একটা চুরুট বার করে বলল, 'তবে দেশলাই দে। চুরুট খাই।'

অশোক অভিভূত হয়ে গিয়েছিল। সে যেন ঘুম ভেঙ্গে উঠে বলল, 'একি কাণ্ড ! আপনারা যে রীতিমত ঝগড়া করছেন !'

হেরম্ব হেসে বলল, 'না স্থপ্রিয়াকে একটু রাগাচ্ছিলাম। ছেলে বেলা গল্প বলুন, গল্প বলুন, বলে এত বিরক্ত করত—কোথায় স্থপ্রিয়া ?'

'রান্নার ব্যবস্থাটা একটু দেখি ?' বলে স্থপ্রিয়া চলে গেল।

হেরম্ব বলল, 'চটেছে।'

অশোক বলল, 'ঠাট্টা তামাসা একেবারে সইতে পারে না।' একটু ইতস্ততঃ করে যোগ দিল 'সেন্স অফ্ হিউমার বড় কম।'

হেরম্ব বলল, 'তাই নাকি !'

'ওকে আমি এত ভয় করি শুনলে আপনি হাসবেন।'

'ওকে কে ভয় করে না, অশোক ? এমন একগুঁয়ে জেদী মেয়ে সংসারে নেই। একবার যা ধরবে শেষ না দেখে ছাড়বে না। ওকে বোধ হয় মেরে ফেলা যায় কিন্তু জেদ ছাড়ানো যায় না।'

'ঠিক। অবিকল মিলে যাচ্ছে।'

হেরম্ব শঙ্কিত হয়ে বলল, 'মিলে যাচ্ছে কি রকম ?'

'আপনি জানেন না ? বিয়ের পর একবছর ধরে চেষ্টা করেও ওকে কিছুতে এখানে আনতে পারি নি। শেষবার আনতে গেলে ওর কাকা বুঝি বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, না যাস্ তো আমার বাড়ীতে থাকতে পাবি নে। আমারও একটু অন্যায় হয়েছিল—রাগারাগি আরম্ভ করে দিয়েছিলাম। যাই হোক, আমার সঙ্গে সেই যে এল তারপর পাঁচ বছরের মধ্যে একদিনও ওর কাকা ওকে নিয়ে যেতে পারে নি। বলে, যাব না বলে এসেছি, যাব কেন ?'

'প্রথমে এখানে আসতে চায় নি জানতাম। আমিও অ

বুঝিয়েছি। কিন্তু আসবার সময় ফিরে যাবে না বলে এসেছিল এখবর তো পাই নি।'

'ছেলেমানুষ রাগের মাথায় কি বলেছে না বলেছে কে খেয়াল করে রেখেছিল? ও যে ফিরে যাবে না প্রতিজ্ঞা করে এসেছিল, ও ছাড়া আর কারুর হয়ত সেকথা এখন মনেও নেই। ওর কাকা এখনো দুঃখ করে আমাকে চিঠি লেখেন। চিঠি পড়ে কাঁদে, কিন্তু একদিনের জন্য যেতে রাজী হয় না।'

হেরম্ব একটু চুপ করে থেকে বলল, 'আমার ধারণা ছিল, তুমিই ওকে পাঠাও না।'

অশোক বিমর্ষভাবে হাসল। বলল, 'কাকার চিঠির যে সব জবাব আমাকে দিয়ে লিখিয়েছে তাতে আপনি কেন সকলেরই ওরকম ধারণা হবে। কথাটা প্রকাশ করবেন না, দাদা। ওদিকে কাকা মনে ব্যথা পাবেন, এদিকে আপনাকে বলার জন্য আমাকে টিঁকতে দেবে না। রাগের মাথায় মত বদলে, 'কাকার কাছে চললাম, তোমার কাছে আর আসব না', বলে বিদায় নিলে তো বিপদেই পড়ে যাব।'

অশোকের কাছে লুকিয়ে হেরম্ব গভীরভাবে চিন্তা করছিল। চারিদিক বিবেচনা করে ক্রমে ক্রমে তার ধারণা হচ্ছে, এতদিন পরে সুপ্রিয়ার সংস্পর্শে না এলেই সে ভাল করত।

সুপ্রিয়ার কোন শিক্ষাটা বাকী আছে যে ওকে আজ নতুন কিছু শেখানো সম্ভব? জীবনের স্তরে স্তরে সুপ্রিয়া নিজেকে সঞ্চয় করেছে, কারো অনুমতির অপেক্ষা রাখে নি, কারো পরামর্শ নেয় নি। ওর সঙ্গে আজ পেরে উঠবে কে?

খানিক পরে সুপ্রিয়া ফিরে এল। তার এক হাতে ব্রাণ্ডির বোতল অন্য হাতে কাঁচের গ্লাস।

'তোমার ওষুধ খাবার সময় হয়েছে। সকালে খাও নি, বড় ডোজ দি, কেমন ?'

অশোক কথা বলতে পারে না। একবার মদের বোতলটার দিকে একবার হেরম্বর মুখের দিকে তাকায়। ভাবে, কি সব কাণ্ড সুপ্রিয়ার !

হেরম্ব একটু হাসে। তার একেবারেই বিস্ময় নেই। সুপ্রিয়া যে নারী তার এই প্রমাণটা সে না দিলেই আশ্চর্য্য হত। এটুকু বিদ্রোহ না করলে ওতো মরে গেছে !

'আমায় একটু দিস তো সুপ্রিয়া।'

'আপনি খাবেন ? মদ কিন্তু, খেলে নেশা হয়। মদে শেষে আপনার আসক্তি জন্মে যাবে না তো ?'

হেরম্ব তবু হাসে।

'আসক্তি জন্মালে কি হবে ? আমার জন্য মদ যোগাড় করে রাখবে কে সুপ্রিয়া ? আমার তো বৌ নেই।'

এক মিনিটের জন্য হেরম্বকে সুপ্রিয়া ঘৃণা করল বৈকি ! রাগে তার মুখ লাল হয়ে গেছে।

'না, আপনার বৌ নেই। আপনার বৌ গলায় দড়ি দিয়েছে।'

একথা হেরম্বর জানা ছিল যে, এরকম অসংযম সুপ্রিয়ার জীবনে আরও একবার যদি এসে থাকে তবে এই নিয়ে দু'বার হল। এই সংখ্যাটি সুপ্রিয়ার বাকী জীবনে কখনো দুই থেকে তিনে পৌছবে কিনা,

সে বিষয়ে বাজী রাখতে হেরম্ব রাজী হবে না। তবু সুপ্রিয়াকে মারতে পারলে হেরম্ব খুসী হ'ত।

অশোক স্তম্ভিত হয়ে বলল, 'এসব তুমি কি বলছ?'

কিন্তু সুপ্রিয়ার মুখে আর কথা নেই। কাঁচের গ্লাসে অশোককে নীরবে খানিকটা মদ ঢেলে দিয়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রাত্রে তারা যখন খেতে বসেছে, খুনীকে সঙ্গে করে সিপাহীরা ফিরে এল। হেরম্ব বহুক্ষণ আত্মসম্বরণ করেছে। সুপ্রিয়ার মুখ ম্লান। আকাশ ঢেকে মেঘ করে এসেছে। পৃথিবী বায়ুহীন। হেরম্ব বলল, 'খুনীটার সঙ্গে একটু আলাপ করতে পারি না, অশোক? কৌতূহল হচ্ছে।'

অশোক বলল, 'বেশ তো।'

সুপ্রিয়া চেষ্টা করে বলল, 'খুনীর সঙ্গে আলাপ করতে চান করবেন, সেজন্য তাড়াতাড়ি করবার দরকার কি! খুনী পালাবে না।'

হেরম্ব হেসে বলল, 'না খুনী পালাবে না। কোমরে দড়ি বাঁধা হয়েছে, না অশোক?'

'নিশ্চয়।'

সুপ্রিয়া অবাক হয়। হেরম্বের কথার মানে বুঝতে চেষ্টা করে। হঠাৎ তার মনে হয়, হেরম্ব নার্ভাস হয়ে পড়েছে, চাল দিচ্ছে, ওর কথার কোন মানে নেই।

খেয়ে উঠে তারা বাইরের বারান্দায় গেল। একটা কালিপড়া লণ্ঠন জ্বলছে। থামে ঠেস দিয়ে ধূলিধূসরিত দেহে খুনী বসে আছে।

যুদ্ধ না করে সে যে পুলিশের কাছে হার মানে নি সর্ব্বাঙ্গে তার অনেকগুলি চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। কোমরেবাঁধা দড়িটা ধরে একজন কনষ্টবল উবু হয়ে বসেছিল, হেরম্ব ও অশোকের আবির্ভাবে ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল।

হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল, 'তোর নাম কিরে?'

'বিরসা।' দু'দিন বনে জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে বুনো জন্তুর মত; কিন্তু বুনো জন্তু সে নয়, মানুষ। প্রশ্নের জবাব দিয়ে বিরসা আবার ঝিমিয়ে পড়ল।

কনষ্টবল বলল, 'আস্নান করনে মাংতা, হুজুর।'

অশোক বলল, 'এক বালতি পানি, ব্যাস্।'

হেরম্বের চিন্তার ধারা অন্যরকম।

'এমন কাজ করলি কেন বিরসা? বৌকে তাড়িয়ে দিলেই পারতিস?'

বিরসা কিছুই বলল না। বৌএর নামোল্লেখে লাল টকটকে চোখ মেলে হেরম্বের দিকে একবার তাকিয়ে আবার ঝিমোতে সুরু করল। অশোক শান্তভাবে বলল, 'ওকে ওসব বলে লাভ কি হেরম্ববাবু?'

'লাভ? লাভ কিছু নেই।' হেরম্ব একটু ভীরু হাসি হাসল, 'আমি শুধু জানতে চাইছিলাম ফেথলেস ওয়াইফকে খুন করে মানুষের অনুতাপ হয় কিনা।'

অশোক আরও শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'কি জানলেন?'

'জানলাম? অনেক কিছু জানলাম, অশোক। আমার বরাবর সন্দেহ ছিল যে, ঈর্ষার বশে যদি কোন স্বামী স্ত্রীকে খুন করে ফেলতে পারে, তাতে আর যাই হোক স্বামীটির চরম ভালবাসার প্রমাণ পাওয়া

যায়, এই থিয়োরি হয়ত সত্য নয়। আজ বুঝলাম আমার সন্দেহ সত্যি! ওর তাকাবার রকম দেখলে, অশোক? স্ত্রীকে খুন করে তার দাম দেবার ভয়ে ও একেবারে মরে গেছে! এটা ভালবাসার লক্ষণ নয়। ও শুধু খুনী, স্রেফ খুনী; প্রেমিক আমি ওকে বলব না। না, স্ত্রীকে ও ভালবাসত না। স্ত্রী আর একজনকে ভালবাসে বলে যে তাকে খুন করে অথবা কষ্ট দেয়, অবহেলা করে, স্ত্রীকে সে ভালবাসে না। তুমি বুঝতে পার না অশোক, ভালবাসার বাড়া-কমা নেই? ভালবাসা ধৈর্য্য আর তিতিক্ষা? একটা একটানা উগ্র অনুভূতি হল ভালবাসা, তুমি তাকে বাড়াতে পার না কমাতে পার না? স্ত্রীকে খুন করে ফেলতে চাও কর, কিন্তু তারপর একদিনের জন্য যদি তোমার ভালবাসায় ভাঁটা পড়ে, মনে হয় খুন না করলেই হত ভাল, সেইদিন জানবে, ভালবেসে স্ত্রীকে তুমি খুন কর নি, করেছিলে অন্য কারণে। স্ত্রীকে যে ভালবাসে সে অপেক্ষা করে। ভাবে, এখন ও ছেলেমানুষ, আর একজনের স্বপ্ন দেখছে। দেখুক, যৌবনে ওর প্রেম পাব। ভাবে, যৌবন ওকে অন্ধ করে রেখেছে ও তাই অতীতের অন্ধকারটাই দেখছে। দেখুক, যৌবন চলে গেলে আমি ওকে ভালবাসাব। আচ্ছা অশোক, তোমার কি কখনো মনে হয় না যে প্রিয়া আর একজনকে ভালবাসছে এই অবস্থাটাকে মৃত্যু দিয়ে অপরিবর্ত্তনীয় করে দেওয়া বোকামি? কষ্ট দিয়ে আর একজনের প্রতি এই ভালবাসাকে,—এই মোহকে প্রবল আর স্থায়ী করে দেওয়া মূর্খামি? একি স্ত্রীকে ভাল না বাসার প্রমাণ নয়? এর চেয়ে স্ত্রীকে বাঁচিয়ে রেখে, তাকে সুখী করে—'

সুপ্রিয়া দরজার কাছে দাঁড়িয়ে শুনছিল। হেরম্বের বক্তৃতার ঠিক

এইখানে তার ফিট হল। গোলমাল শুনে দু'জনে গিয়ে দেখে, সুপ্রিয়া বুকের নীচে দুটি হাত জড়ো করে উপুড় হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে।

অশোক চেঁচিয়ে বলল, 'ওকে শুনিয়ে এসব কথা কি আমায় না বললেই হত না? রাস্কেল!'

রাতদুপুরে সুপ্রিয়া হেরম্বের ঘরে এল।

'জেগে আছেন?'

'জেগেই আছি সুপ্রিয়া।'

'বিছানায় উঠব না। শরীরটা এত দুর্ব্বল লাগছে, দাঁড়াতেও কষ্ট হচ্ছে।'

'শুয়ে থাকলি না কেন, সুপ্রিয়া? কেন উঠে এলি?'

'সকালে চলে যাবেন, কয়েকটা কথা আপনাকে বলতে চাই। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে, হেরম্ববাবু।'

হেরম্ব চুপ করে থাকে।

'মাথা ঘুরে হয়ত আবার আমি ফিট হয়ে পড়ে যাব। সবাই উঠে আসবে। বলুন কিছু, বলুন যাহোক কিছু।'

'তুই তো চিরদিন লক্ষ্মী মেয়ে ছিলি সুপ্রিয়া। এত অবাধ্য এত দুরন্ত কবে থেকে হলি?'

সুপ্রিয়াকে অন্ধকারেও দেখা যায়। কারণ, অন্ধকারে সে গাঢ়তর অন্ধকার হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'আমার সত্যি দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে।'

হেরম্ব এবারও চুপ করে থাকে।

'আপনি আমাকে ডাকলেই পারেন। আপনি বললেই বিছানায় উঠে বসতে পারি।'

হেরম্ব তবু চুপ করে থাকে। কথা বলবার আগে সুপ্রিয়া এবার অপেক্ষা করে অনেকক্ষণ।

'আজ টের পেলাম, বৌ কেন গলায় দড়ি দিয়েছিল। আপনি মেয়েমানুষের সর্ব্বনাশ করেন কিন্তু তাদের ভার ঘাড়ে নেবার সময় হলেই যান এড়িয়ে। কাল আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে বলে বিছানায় উঠে বসতে দিচ্ছেন না। আমি দাঁড়াতে পারছি না, তবু!'

হেরম্ব বলে, 'শোন সুপ্রিয়া। আজ তোর শরীর ভাল নেই, তাছাড়া নানা কারণে উত্তেজিত হয়ে আছিস। ধরতে গেলে আজ তুই রোগী, অসুস্থ মানুষ। আজ তুই যা চাইবি তাই কি তোকে দেওয়া যায়? তার আর জ্বরের সময় রোগীকে কুপথ্য দিলে দোষ কি ছিল? বেশী ঝাল হয়েছিল বলে অশোককে তুই আজ মাছের ঝোল খেতে দিস নি মনে আছে? তুই আজ ঘুমিয়ে থাকবি যা সুপ্রিয়া। ছ'মাসের মধ্যে তোর সঙ্গে আমার দেখা হবে। তখন দু'জনে মিলে পরামর্শ করে যা হয় করব।'

'আরও ছ'মাস!'

'ছ'মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে।'

'যদি দেখা না হয়? আমি যদি মরে যাই?'

জীবনের দিগন্তে তাকে অস্তমিত রেখে সুপ্রিয়া মরতেও রাজী নয়? হেরম্বের দ্বিধা হয়, সংশয় হয়। জীবনকে কোনমতেই পরিপূর্ণ করবার

উপায় নেই। তবু সুপ্রিয়াকে জীবনের সঙ্গে গেঁথে ফেললে হয়ত চিরদিনের জন্য জীবন এত বেশী অপূর্ণ থাকবে যে, একদিন আপশোষ করতে হবে হেরম্বের এই আশঙ্কা কমে আসে। তার মনে হয়, আজ একদিনে সুপ্রিয়া ক্ষণে ক্ষণে নিজের যে নব নব পরিচয় দিয়েছে হয়ত তা বহু সংযম, বহু সাবধানতা ও কার্পণ্যের বাধা ঠেলেই বাইরে এসেছে। হয়ত পাঁচবছর ধরে সুপ্রিয়া যে ঐশ্বর্য্য সংগ্রহ করেছে তা অতুলনীয়, কল্পনাতীত। কিন্তু তবু হেরম্ব সাহস পায় না। নিজেকে দান করার চেয়ে কঠিন কাজ জগতে কি আছে? অত বড় দাতা হবার সাহস হেরম্ব সহসা সংগ্রহ করে উঠতে পারে না।

বলে, 'মরবি কেন, সুপ্রিয়া? লক্ষ্মী মেয়ের মত তুই বেঁচে থাকবি।'

সুপ্রিয়া চলে গেলে হেরম্ব শয্যা ত্যাগ করে। দরজা খুলে বাইরে যায়। থানার পাহারাদার বলে, 'কিধার যাতা বাবু?'

'ঘুমনে যাতা। নিদ হোতা নেহি।'

আকাশ মেঘে ঢাকা। ওদিকে বিদ্যুৎ চমকায়। শুকনো ঘাসে-ঢাকা মাঠে হেরম্ব আস্তে আস্তে পায়চারি করে। আজ রাত্রে যদি বৃষ্টি হয় কাল হয়ত মাঠের বিবর্ণ বিশীর্ণ তৃণ প্রাণবন্ত হয়ে উঠবে।

দ্বিতীয় ভাগ

রাতের কবিতা

প্রেমে বন্ধু পঞ্জরের বাধা,
আলোর আমার মাঝে মাটির আড়াল,
রাত্রি মোর ছায়া পৃথিবীর।
বাষ্পে যার আকাশেরে বাধা,
সাহারার বালি যার উষর কপাল,
এ কলঙ্ক সে মৃত্যু সাকার।

শান্ত রাত্রি নীহারিকা লোকে,
বন্দী রাত্রি মোর বুকে উতল অধীর,
অন্তরার সঙ্কীর্ণ আকাশ।
মৃত্যু মুক্তি দেয় না যাহাকে
প্রেম তার মহামুক্তি।—নূতন শরীর
মুক্তি নয়, মুক্তির আধার।

হেরম্ব বলল, 'এতকাল পরে এইখানে সমুদ্রের ধারে আপনার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে এ কথা কল্পনাও করতে পারি নি। বছর বারো আগে মধুপুরে আপনার সঙ্গে একবার দেখা হয়েছিল, মনে আছে ?

অনাথ বলল, 'আছে।'

'সেবার দেখা হয়ে না থাকলে আপনাকে হয়ত আজ চিনতেই পারতাম না। সত্যবাবুর বাড়ী মাষ্টারি করতে করতে হঠাৎ আপনি যেদিন চলে গেলেন, আমার বয়স বারোর বেশী নয়। তারপর কুড়ি একুশ বছর কেটে গেছে। আপনার চেহারা ভোলবার মত নয়, তবু মাঝখানে একবার দেখা হয়ে না থাকলে আপনাকে হয়ত আজ চিনতে না পেরে পাশ কাটিয়ে চলে যেতাম।'

অনাথ একটু নিস্তেজ হাসি হাসল।

'আমাকে চিনেও চিনতে না পারাই তোমার উচিত ছিল হেরম্ব।'

'আমার মধ্যে ওসব বাহুল্য নেই মাষ্টারমশায়। সত্যবাবুর মেয়ে কেমন আছেন ?'

'ভালই আছেন।'

হেরম্ব অবিলম্বে আগ্রহ প্রকাশ করে বলল, 'চলুন, দেখা করে আসি।'

অনাথ ইতস্ততঃ করে বলল, 'দেখা করে খুসী হবে না হেরম্ব।'

'কেন ?'

'মালতী একটু বদলে গেছে।'—অনাথ পুনরায় তার স্তিমিত হাসি হাসল।

হেরম্ব বলল, 'তাতে আশ্চর্য্যের কি আছে ? এতকাল কেটে গেছে, উনি একটু বদলাবেন বৈ কি ! আপনি হয়ত জানেন না, ছেলেবেলা আপনার আর সত্যবাবুর মেয়ের কথা যে কত ভেবেছি তার ঠিক নেই। আপনাদের মনে হত রূপকথার রহস্যময় মানুষ।'

অনাথ বলল, 'সেটা বিচিত্র নয়। ওসব ব্যাপারে ছোট ছেলেদের মনেই আঘাত লাগে বেশী। তারা খানিকটা শুনতে পায়, খানিকটা বড়রা তাদের কাছ থেকে চেপে রাখে। তার ফলে ছেলেরা কল্পনা আরম্ভ করে দেয়। তাদের জীবনে এর প্রভাব কাজ করে। আচ্ছা, তুমি কখনো ঘৃণা কর নি আমাদের ?'

'না। সংসারের সাধারণ নিয়মে আপনাদের কখনো বিচার করতে পারি নি। মধুপুরে আপনাদের সঙ্গে যখন দেখা হল, আমি ছেলেমানুষের মত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। হয়ত ছেলেবেলা থেকেই আপনাকে জানবার বুঝবার জন্য আমার মনে প্রবল আগ্রহ ছিল। এখনো যে নেই সে কথা জোর করে বলতে পারব না। আমার মনে যত লোকের প্রভাব পড়েছে, বিশবছর অদৃশ্য থেকেও আপনি তাদের মধ্যে প্রধান হয়ে আছেন।'

অনাথ নিশ্বাস ফেলে বলল, 'ভগবান! পৃথিবীতে মানুষ একা বেঁচে থাকতে আসে নি সকলের এটা যদি সব সময় খেয়াল থাকত! মালতীকে না দেখলে তোমার চলবে না হেরম্ব?'

হেরম্ব ক্ষুণ্ণ হয়ে বলল, 'আপত্তি করছেন কেন?'

অনাথ তার কাঁধে হাত রেখে বলল, 'দুর্ব্বলতা। মনের দুর্ব্বলতা হেরম্ব। চলো।'

সহরের নির্জ্জন উপকণ্ঠে সাদা বাড়ীটি পার হয়ে হেরম্বের মনে হল, এইখানে সহর শেষ হয়েছে। অনেকক্ষণ সমুদ্রের অর্থহীন অবিরাম কলরব শুনে হেরম্বের মস্তিষ্ক একটু শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। এখানে সমুদ্রের ডাক মৃদুভাবে শোনা যায়। হেরম্বের নিজকে হঠাৎ ভারমুক্ত মনে হচ্ছিল। অনাথ গভীর চিন্তামগ্ন অন্যমনস্ক অবস্থায় পথ চলছে। হেরম্ব তাকে প্রশ্ন করে জবাব পায় নি একটারও। বেলা আর বেশী অবশিষ্ট নেই। পথের দু'পাশে খোলা মাঠে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে বলে রাখালেরা গরুগুলিকে একত্র করছে। পথ সোজা এগিয়ে গিয়েছে সামনে।

আরো খানিকদূর গিয়ে হেরম্ব ভাঙ্গা প্রাচীরে ঘেরা বাগানটি দেখতে পেল। সামনে পৌঁছে হঠাৎ সচেতন হয়ে অনাথ বলল, 'এই বাড়ী।'

কোথায় বাড়ী? বাড়ী হেরম্ব দেখতে পেল না। বাগানের শেষের দিকে গাছপালায় প্রায় আড়াল-করা ছোট একটি মন্দির মাত্র তার চোখে পড়ল। বাগানে গোলাপ গন্ধরাজ ফোটে কিনা বাইরে থেকে অনুমান করার উপায় ছিল না। যে গাছে হয়ত ফুল ফোটে কিন্তু গন্ধ দেয় না, যে গাছের ফল অথবা পাতা মানুষে খায়, তাই দিয়ে বাগানটিকে ঠেসে

ভর্ত্তি করা হয়েছে। সমস্ত বাগান জুড়ে গাছের নিবিড় ছায়া আর অস্বাভাবিক স্তব্ধতা।

কাঠের ভগ্নপ্রায় গেটটি খুলে অনাথ বাগানে প্রবেশ করল। তাকে অনুসরণ করে বাগানের মধ্যে প্রথম পদক্ষেপের সঙ্গে হেরম্বের মনে হল এ যেন একটা পরিবর্ত্তন, একটা অকস্মাৎ সংঘটিত বৈচিত্র্য। মানুষের অশান্ত কলরবভরা পৃথিবীতে, ভাঙ্গা প্রাচীরের আবেষ্টনীর মধ্যে এমন সংক্ষিপ্ত একটি স্থানে এই মৌলিক শান্ত আবহাওয়াটি অক্ষুণ্ণ থাকা হেরম্বের কাছে বিস্ময়ের মত প্রতিভাত হল।

বাগানের সরু পথটি ধরে এঁকে বেঁকে এগিয়ে গাছের পর্দ্দা পার হয়ে তারা দাঁড়াল। এখানে খানিকটা স্থান একেবারে ফাঁকা। সামনে সেই পথ থেকে দেখা মন্দির। মন্দিরের দক্ষিণে অল্প তফাতে পুরানো একটি ইটের বাড়ী। মন্দির আর বাড়ী দুই-ই নোনা-ধরা।

মন্দিরের দরজা বন্ধ। দরজার সামনে ফাটলধরা চত্বরে গরদের সাড়ী পরা স্থূলাঙ্গী একটি রমণী বসেছিল। যৌবন তার যাব যাব করছে। কিন্তু গায়ের রঙ এখনো অসাধারণ উজ্জ্বল। চেহারা জমকালো, গম্ভীর।

'কাকে আনলে গা? অতিথি নাকি?'

শ্লেষ্মাজড়িত চাপা গলা। হেরম্ব একটু অভিভূত হয়ে পড়ল।

অনাথ বলল, 'হয়ত চিনতে পারবে মালতী। কলকাতায় তোমাদের বাড়ীর পাশে থাকত। নাম হেরম্ব। মধুপুরেও একবার দেখেছিলে।'

মালতী বলল, 'চিনেছি। তা, ওকে আবার ধরে আনার কি দরকার ছিল! যাক, এনেছ যখন, কি আর হবে? বোস বাছা। আহা, সিঁড়িতেই বোস না, মন্দিরের সিঁড়ি পবিত্র। কাপড় ময়লা হবার ভয়

নেই, ছু'বেলা সিঁড়ি ধোয়া হচ্ছে।···তুমি বুঝি গিয়েছিলে সমুদ্রে ? একদিন সমুদ্রে না গেলে নয় ! যদি গেলেই, বলে কি যেতে নেই ?'

অনাথ বলল, 'আসন থেকে উঠেই চলে গিয়েছিলাম মালতী। তোমাকে বলে যাওয়ার কথা মনে ছিল না।'

মালতী বলল, 'তবু ভাল, কথার একটা জবাব পেলাম। সহর হয়ে এলে, আমার জিনিষটা আনলে না যে ? কাল থেকে পই পই করে বলছি।'

অনাথ বলল, 'তোমাকে তো কবে বলে দিয়েছি ওসব আমি এনে দেব না।'

মালতী উষ্ণ হয়ে বলল, 'কেন, দেবে না কেন ? তোমার কি এল গেল !'

'গোল্লায় যেতে চাও তুমি নিজে নিজেই যাও। আমি সাহায্য করতে প্রস্তুত নই।'

'কেতার্থ করলে ! আমাকে গোল্লায় এনেছিল কে বের করে ? পরের কাছে অপমান করা হচ্ছে !'

মালতী হঠাৎ হেসে উঠল, 'তুমি না এনে দিলেও আমার এনে দেবার লোক আছে, তা মনে রেখো।—চললে কোথায় শুনি ?'

'স্নান করব'—সংক্ষেপে এই জবাব দিয়ে অনাথ বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেল।

হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল, 'সহর থেকে কি জিনিষ আনার কথা ছিল ?'

'আমার একটা ওষুধ।' বলে মালতী গম্ভীর হয়ে গেল। তার গাম্ভীর্য্য হেরম্বকে বিস্মিত করতে পারল না। সে টের পেয়েছিল, মালতীর

উচ্চহাসি এবং মুখভার কোনটাই সত্য অথবা স্থায়ী নয়। যে কোনো মুহূর্ত্তে একটা অন্তর্দ্ধান করে আর একটা দেখা দিতে পারে। এর প্রমাণ দেবার জন্যই যেন মালতীর মুখে হঠাৎ হাসি দেখা গেল, 'কাণ্ড দেখলে লোকটার? তোমায় ডেকে এনে স্নান করতে চলে গেল। জ্বালিয়ে মারে। জানলে? জ্বালিয়ে মারে।...তুমি কিন্তু অনেক বড় হয়ে গেছ!'

'আশ্চর্য্য নয়। বত্রিশ বছর বয়স হয়েছে।'

'তাই বটে! আমি কি আজকে বাড়ী ছেড়েছি! কতযুগ হয়ে গেল। দাঁড়াও, কতবছর হল যেন? কুড়ি। ষোল বছর বয়সে বেরিয়ে এসেছিলাম, আমার তবে ছত্রিশ বছর বয়স হয়েছে! আঃ কপাল, বুড়ী হয়ে পড়লাম যে! কাণ্ড ত্যাখো।'

হেরম্বকে আগাগোড়া সে ভাল করে দেখল।

'তোমায় তো বেশ ছেলেমানুষ দেখাচ্ছে? সাতাশ আটাশের বেশী বয়স মনে হয় না। তুমি একদিন আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিলে গো! তখন হেসে না মরে যদি রাজী হয়ে যেতাম! আমার তাহলে আজ দিব্যি একটি কচি সুপুরুষ বর থাকত!'

হেরম্ব হেসে বলল, 'মাষ্টারমশায় তখন যে রকম সুপুরুষ ছিলেন—'

'মনে আছে?' মালতী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, 'বলত, সেই মানুষকে এখন দেখলে চেনা যায়? আমার বরং এখনো কিছু কিছু রূপ আছে। দেখে তুমি মুগ্ধ হচ্ছ না?'

'না। ছেলেবেলা মুগ্ধ করে যে কষ্টটাই দিয়েছিলেন—'

'তাই বলে এখন মুখের ওপর মুগ্ধ হচ্ছ না বলে প্রতিশোধ নেবে? তুমি তো লোক বড় ভয়ানক দেখতে পাই। বিয়ে করেছ?'

'করেছিলাম। বৌটি স্বর্গে গেছে।'

'ছেলে-মেয়ে ?'

'একটা মেয়ে আছে, দু'বছরের। আছে বলছি এই জন্য যে পনের দিন আগে ছিল দেখে এসেছি। এর মধ্যে মরে গিয়ে থাকলে নেই।'

'বালাই ষাট, মরবে কেন! এখন তুমি কি করছ ?'

'কলেজে মাষ্টারি করি।'

'বৌএর জন্য বিবাগী হয়ে বাড়ীঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড় নি ত ?'

'না। সারাবছর ছেলেদের শেলি কীট্‌স্ পড়িয়ে একটু শ্রান্ত হয়ে পড়ি মালতী-বৌদি। গরমের ছুটিতে তাই একবার করে বেড়াতে বেরুনো অভ্যাস করেছি। এবার গিয়েছিলাম রাঁচী। সেখান থেকে বন্ধুর নেমন্তন্ন রাখতে এসেছি এখানে।'

'বন্ধু কে ?'

'শঙ্কর সেন, ডেপুটি।'

'বেশ লোক। বৌটি ভারি ভক্তিমতী। এই মন্দির সংস্কারের জন্য একশ' টাকা দান করেছে।'

মালতী ভাবতে ভাবতে এই কথা বলছিল, অন্যমনস্কের মত। হঠাৎ সে একটু অতিরিক্ত আগ্রহের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এখানে কতদিন থাকবে ?'

'দশ পনের দিন। ঠিক নেই।'

'ভালই হল।'

হেরম্ব কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কিসের ভাল হল ?'

মালতী হাসল।

'তোমাকে দেখে আনন্দ হচ্ছে। তাই বললাম। ছেলেদের তুমি কি পড়াও বললে?'

হেরম্ব হেসে বলল, 'কবিতা পড়াই। ভাল ভাল ইংরেজ কবির বাছা বাছা খারাপ কবিতা। বেঁচে থেকে সুখ নেই মালতী-বৌদি।'

আকস্মিক দার্শনিক মন্তব্যে মালতী হাসল। গলার শ্লেষ্মা সাফ করে বলল, 'সুখ? নাইবা রইল সুখ! সুখ দিয়ে কি হবে? সুখ তো শুঁটকি মাছ! জিভকে ছোটলোক না করলে স্বাদ মেলে না। সুখ স্থান জুড়ে নেই, প্রেম দিয়ে ভরে নাও, আনন্দ দিয়ে পূর্ণ কর। সুবিধা কত! মদ নেই যদি, মদের নেশা সুধায় মেটাও! বাস্, আর কি চাই?

হেরম্ব মালতীর দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, 'দিন সুধা।'

'আমি দেব?' মালতী জোরে হেসে উঠল, 'আমার কি আর সে বয়স আছে!'

'তবে একটু জল দিন। তেষ্টা পেয়েছে।'

'তা বরং দিতে পারি।' বলে মালতী ডাকল, 'আনন্দ, আনন্দ! একবার বাইরে শুনে যাও।'

'আনন্দ কে?' হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল।

'আমার অনন্ত আনন্দ! মনে নেই? মধুপুরে দেখেছিলে। চুমু খেয়ে কাঁদিয়ে ছেড়েছিলে।'

'ও, আপনার সেই মেয়ে। তার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম।'

'ভুলে গিয়েছিলে? তুমি অবাক মানুষ হেরম্ব! সেকি আমার ভুলবার মত মেয়ে?'

হেরম্ব বলল, 'ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কথা আমার মনে থাকে না মালতী-বৌদি। আপনার মেয়ে তখন খুব ছোটই ছিল নিশ্চয় ?'

মালতী স্বীকার করে বলল, 'নিশ্চয় ছোট ছিল। ছোট না থাকলে চুমু খেয়ে তাকে কাঁদাতে কি করে তুমি! তাছাড়া, তখন ছোট না থাকলে মেয়ে তো আমার এ্যাদ্দিনে বুড়ী হয়ে যেত!'

তার পর এল আনন্দ।

আনন্দকে দেখে হেরম্ব হঠাৎ অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ল। আনন্দ অপ্সরী নয়, বিদ্যাধরী নয়, তিলোত্তমা নয়, মোহিনী নয়। তাকে চোখে দেখেই মুগ্ধ হওয়া যায়, উত্তেজিত হয়ে ওঠার কোন কারণ থাকে না। কিন্তু হেরম্বের কথা আলাদা। এই মালতীকে নয়, সত্যবাবুর মেয়ে মালতীকে সে আজও ভুলতে পারে নি। এই স্মৃতির সঙ্গে তার মনে বারোবছর বয়সের খানিকটা ছেলেমানুষী, খানিকটা কাঁচা ভাবপ্রবণতা আজও আট্‌কে রয়ে গিয়েছে। আনন্দকে দেখে তার মনে হল সেই মালতীই যেন বিশ্ব-শিল্পীর কারখানা থেকে সংস্কৃত ও রূপান্তরিত হয়ে, গত বিশ বছর ধরে প্রকৃতির মধ্যে, নারীর মধ্যে, বোবা পশু ও পাখীর মধ্যে, ভোরের শিশির আর সন্ধ্যাতারার মধ্যে রূপ, রেখা ও আলোর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, তাকে তৃপ্ত করার যোগ্যতা অর্জ্জন করে, তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। শীতকালের ঝরা শুকনো পাতাকে হঠাৎ একসময় বসন্তের বাতাস এসে যে ভাবে নাড়া দিয়ে যায়, আনন্দের আবির্ভাবও হেরম্বের জীর্ণ পুরাতন মনকে তেমনি ভাবে নাড়া দিয়ে দিল।

বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে সে আনন্দকে দেখতে লাগল। তার মনের উপর দিয়ে কুড়ি বছর ধরে যে সময়ের স্রোত বয়ে গেছে তাই যেন কয়েকটি মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘনীভূত হয়ে এসেছে।

এই উচ্ছ্বসিত আবেগ হেরম্বের মনে প্রশ্রয় পায়। আবেগ আরও তীব্র হয়ে উঠলেই সে যেন তৃপ্তি পেত। তার বন্দী কল্পনা দীর্ঘকাল পরে হঠাৎ যেন আজ মুক্তি পায়। তার সবগুলি ইন্দ্রিয় অসহ্য উত্তেজনায় অসংযত প্রাণ সঞ্চয় করে। চারিদিকের তরুলতা তার কাছে অবিলম্বে জীবন্ত হয়ে ওঠে। শেষ অপরাহ্নের রঙীন সূর্য্যালোককে তার মনে হয় চারিদিকে ছড়িয়ে-পড়া রঙীন স্পন্দমান জীবন।

বাড়ীর দরজা থেকে কাছে এসে দাঁড়ানো পর্য্যন্ত আনন্দ হেরম্বকে নিবিড় মনোযোগের সঙ্গে দেখেছিল। সে এসে দাঁড়ানো মাত্র হেরম্ব তার চোখের দিকে তাকাল। কৌতূহল অন্তর্হিত হয়ে আনন্দের চোখে তখন ঘনিয়ে এল ভাব ও ভয়। হেরম্ব এটা লক্ষ্য করেছে। সে জানে এই ভয় ভীরুতার লক্ষণ নয়, মোহের পরিচয়। আনন্দের চোখে যে প্রশ্ন ছিল, হেরম্বের নির্ব্বাক নিষ্ক্রিয় জবাবটা তাকে মুগ্ধ করে দিয়েছে।

সুপ্রিয়াকে ত্যাগ করে এসে হেরম্বের যা হয় নি, এখন তাই হল। নিজের কাছে নিজের মূল্য তার অসম্ভব বেড়ে গেল। সে জটিল জীবন-যাপনে অভ্যস্ত। সাধারণ সুস্থ মানুষ সে নয়। মন তার সর্ব্বদা অপরাধী, অহরহ তাকে আত্মসমর্থন করে চলতে হয়। জীবনে সে এত বেশী পাক খেয়েছে যে মাথা তার সর্ব্বদাই ঘোরে। আনন্দ, পুলক ও উল্লাস সংগ্রহ করা আজ তার পক্ষে অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু আনন্দ আজ তাকে আর তার দৃষ্টিকে দেখে মুগ্ধ হয়ে, বিচলিত হয়ে, তাকে

ছেলেমানুষের মত উল্লসিত করে দিয়েছে। তার দেহমন হঠাৎ হাল্কা হয়ে গিয়েছে। তার মনে ভাষার মত স্পষ্ট হয়ে এই প্রার্থনা জেগে উঠেছে, আনন্দ যেন চলে যাবার আগে আর একবার তার চোখের দিকে এমনি ভাবে তাকিয়ে যায়।

'ডাকলে কেন মা?' আনন্দ মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল।

'একে এক গেলাস জল এনে দে।'

আনন্দ জল আনতে চলে গেলে হেরম্ব যেন অসুস্থ হয়ে ঝিমিয়ে পড়ল। অনেকদিন আগে অস্ত্রোপচারের জন্য তাকে একবার ক্লোরোফর্ম্ম করা হয়েছিল। সেই সময়কার অবর্ণনীয় অনুভূতি যেন ফিরে এসেছে।

মালতী নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি রকম দেখলে আমার আনন্দকে?

'বেশ, মালতী-বৌদি।'

'আঠার বছর আগে ওকে কোলে পেয়েছিলাম হেরম্ব। জীবনে আমার দুটি সুদিন এসেছে। প্রথম, তোমার মাষ্টারমশায় যেদিন দাদাকে পড়াতে এলেন, অন্দরের জানালায় অন্ধকারে ঠায় দাঁড়িয়ে আমি লোকটাকে দেখলাম, সেদিন। আর যেদিন আনন্দ কোলে এল। প্রসববেদনা কেমন জান?'

হেরম্ব জোর দিয়ে বলল, 'জানি।'

'জানো! পাগল নাকি! তুমি কি করে জানবে!'

'আমি এককালে কবিতা লিখতাম যে মালতী-বৌদি।'

'কবিতা লেখা আর প্রসববেদনা এক? মাথা খারাপ না হলে কেউ এমন কথা বলে! তোমাতে আর ভগবান লক্ষ্মীছাড়াতে তাহলে আর

কোন প্রভেদ থাকত না বাপু। আমরা প্রসব করি ভগবানের কবিতাকে, তার তুলনায় তোমাদের কবিতা ইয়ার্কি ছাড়া আর কি! যাই হোক, আনন্দকে দেখে আমি সেদিন প্রসববেদনা ভুলে গেলাম হেরম্ব।'

'সব মা-ই তাই যায়, মালতী-বৌদি।'

মালতী রাগ করে বলল, 'তুমি বড় রূঢ় কথা বলো হেরম্ব!'

আনন্দ জল আনলে গেলাস হাতে নিয়ে হেরম্ব বলল, 'বোসো আনন্দ।'

আনন্দ অনুমতির জন্য মালতীর মুখের দিকে তাকাল।

মালতী বলল, 'বোস লো ছুঁড়ি, বোস। এ ঘরের লোক। কেমন ঘরের লোক জানিস? আমার ছেলেবেলার ভালবাসার লোক। ওর যখন বারো বছর বয়স আমাকে বিয়ে করার জন্য ক্ষেপে উঠেছিল। রোজ সন্দেশ-টন্দেশ খাইয়ে কত কষ্টে যে ভুলিয়ে রাখতাম সে কেবল আমিই জানি। হাসিস ক্যানো লো! একি হাসির কথা? বিশ বছর ধরে খুঁজে খুঁজে তোর বাপকে খুন করতে এসেছে, তা জানিস্?

আনন্দ বলল, 'কি সব বলছ মা? এর মধ্যেই—'

'এর মধ্যেই কি লো? বল না, এর মধ্যেই কি বলছিস্?'

'কিছু না মা। চুপ কর।'

মালতী কিন্তু ছাড়ল না।

'এর মধ্যেই গিলেছি নাকি আজ, এই তো বলছিলি? না গিলি নি! কারণ হল সাধনে বসার জন্য, যখন তখন আমি ওসব গিলি না বাপু।'

হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল, 'কি মালতী-বৌদি? মদ?'

'মদ নয়। কারণ।' ধর্ম্মের জন্য একটু একটু খাওয়া, এই আর কি!'

আনন্দ বলল, 'মদ খাওয়া হল ধর্ম্ম!'

মালতী বলল, 'নয়? এবার বাবা এলে শুধোস্।' মালতী হেরম্বের দিকে তাকাল, 'বাবার আদেশে একটু একটু খাই হেরম্ব। প্রথমে হয়েছিলাম বৈষ্ণব—ভক্তিমার্গ পোষাল না। এবার তাই জোরালো সাধনা ধরেছি। বাবা বলেন—'

'বাবা কে?'

'আমার গুরুদেব। শ্রীমৎ স্বামী মশালবাবা।—নাম শোন নি? দিবারাত্রি মশাল জ্বেলে সাধন করেন।' মালতী যুক্ত কর কপালে ঠেকাল।

আনন্দ বলল, 'কারণ খাওয়া যদি ধর্ম্ম মা, আমি সেদিন একটু খেতে চাইলাম বলে মারতে উঠেছিলে কেন? কাল থেকে আমিও পেট ভরে ধর্ম্ম করব মা।'

হেরম্ব ভাবে: আনন্দ একথা বলল কেন? সে কারণ খায় না আমাকে একথা শোনাবার জন্যে?

মালতী বলল, 'করেই দেখিস!'

'তুমি কর কেন?'

'আমার ধর্ম্ম করবার বয়স হয়েছে। তুই একরত্তি মেয়ে, তোর ধর্ম্ম আলাদা। আমার মত বয়স হলে তখন তুই এসব ধর্ম্ম করবি, এখন কি? যে বয়সের যা। তুই নাচিস্, আমি নাচি?'

আনন্দ হেসে বলল, 'নেচো না, নেচো। নাচতে তো বাপু একদিন এখনও এক একদিন বেশী করে কারণ খেলে যে নাচটাই নাচো—'

'তোর মত বেয়াদব মেয়ে সংসারে নেই আনন্দ !'

মালতীর পরিবর্ত্তন হেরম্ব বুঝতে পারছিল না। সে মোটা হয়েছে, তার কণ্ঠ কর্কশ, তার কথায় ব্যবহারে কেমন একটা নিলাজ রুক্ষতার ভাব। আনন্দের মধ্যস্থতা না থাকলে মালতীর মধ্যে সত্যবাবুর মেয়ের কোন চিহ্নই খুঁজে না পেয়ে হেরম্ব হয়ত আজ আরও একটু বুড়ো, আরও একটু বিষাদগ্রস্ত হয়ে বাড়ী ফিরত। কুড়ি বছরের পুরানো গৃহত্যাগের ব্যাপারটার উল্লেখ মালতী নিজে থেকেই করেছিল, দ্বিধা করে নি, লজ্জা পায় নি। এটা সে বুঝতে পারে। বুঝতে পারে যে দশ বছরের মধ্যে একদিনের লজ্জাতুরা নববধূ যদি সকলের সামনে স্বামীকে বাজারের ফর্দ্দ দিতে পারে, মালতীর বাড়ী ছেড়ে বেরিয়ে আসাটা কুড়িবছর পরে তুচ্ছ হয়ে যাওয়া আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু তার পরিচয় পাবার পরেও কারণ না এনে দেবার জন্য অনাথকে সে তো অনুযোগ পর্য্যন্ত করেছিল ! আনন্দের সঙ্গে তর্ক করে মদকে কারণ নাম দিয়ে ধর্ম্মের নামে নিজেকে সমর্থন করতেও তার বাধে নি। মালতী এভাবে বদলে গিয়েছে কেন ? তার ছেলেবেলার রূপকথার অনাথ আজও তেমনি আছে, মালতীকে এভাবে বদলে দিল কিসে ?

আনন্দ আর একবারও হেরম্বের দিকে তাকায় নি। কিন্তু ক্ষণে ক্ষণে তাকে না দেখে হেরম্বের উপায় ছিল না। ওর সম্বন্ধে একটা আশঙ্কা তার মনে এসেছে যে, মালতীর পরিবর্ত্তন যদি বেশী দিনের হয় আনন্দের চরিত্রে হয়ত তার ছাপ পড়েছে। আনন্দের কথা শুনে, হাসি দেখে, মালতীর দেহ দিয়ে নিজেকে অর্দ্ধেক আড়াল করে ওর বসবার ভঙ্গী দেখে মনে হয় বটে যে, সত্যবাবুর মেয়ের মধ্যে যেটুকু অপূর্ব্ব ছিল,

যতখানি গুণ ছিল, শুধু সেইটুকুই সে নকল করেছে ; মালতীর নিজের অর্জ্জিত অমার্জ্জিত রুক্ষতা তাকে স্পর্শ করে নি। কিন্তু সেই সঙ্গে এই কথাটাও ভোলা যায় না যে, যে আবহাওয়া মালতীকে এমন করেছে আনন্দকে তা একেবারে রেহাই দিয়েছে।

মালতীর উপর হেরম্বের রাগ হতে থাকে। এমন মেয়ে পেয়েও তার মা হয়ে থাকতে না পারার অপরাধের মার্জ্জনা নেই। মালতী আর যাই করে থাক হেরম্ব বিনা বিচারে তাকে ক্ষমা করতে রাজী আছে, মদ খেয়ে ইতিমধ্যে সে যদি নরহত্যাও করে থাকে সে চোখ কান বুজে তাও সমর্থন করবে। কিন্তু মা হয়ে আনন্দকে সে যদি মাটি করে দিয়ে থাকে হেরম্ব কোনদিন তাকে মার্জ্জনা করবে না।

খানিক পরে অনাথ বেরিয়ে এল। স্নান সমাপ্ত করে এসেছে।

'আমার আসন কোথায় রেখেছ মালতী ?'

মালতী বলল, 'জানি না। হ্যাঁগা, স্নান যদি করলে আরতিটা আজ তুমিই করে ফেল না ? বড় আলসেমি লাগছে আমার।'

অনাথ বলল, 'আমি এখুনি আসনে বসব। আরতির জন্য সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারব না।'

'একজনকে বাড়ীতে ডেকে এনে এমন নিশ্চিন্ত মনে বলতে পারলে আসনে বসব ? কে তোমার অতিথিকে আদর করবে শুনি ? স্বার্থপর আর কাকে বলে ! সন্ধ্যা হতেই বা আর দেরী কত, এ্যাঁ ?'

অনাথ তার কথা কানে তুলল না। এবার আনন্দকে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার আসন কে সরিয়েছে আনন্দ?'

'আমি তো জানিনে বাবা?'

অনাথ শান্তভাবেই মালতীকে বলল, 'আসনটা কোথায় লুকিয়েছ বার করে দাও মালতী। আসন কখনো সরাতে নেই এটা তোমার মনে রাখা উচিত ছিল।'

মালতী বলল, 'তুমি অমন কর কেন বলত? বোসোনা এখানে,—একটু গল্পগুজব কর। এতকাল পরে হেরম্ব এসেছে, দু'দণ্ড বসে কথা না কইলে অপমান করা হবে না?'

হেরম্ব প্রতিবাদ করে বলতে গেল, 'আমি—'

কিন্তু মালতী তাকে বাধা দিয়ে বলল, 'আমাদের ঘরোয়া কথায় তুমি কথা কয়ো না হেরম্ব।' হেরম্ব আহত ও আশ্চর্য হয়ে চুপ করে গেল। অনাথ তার বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল, 'আমি অপমান করব কল্পনা করে তুমি নিজেই যে অপমান করে বসলে মালতী! কিছু মনে কোরো না হেরম্ব। ওর কথাবার্তা আজকাল এইরকমই দাঁড়িয়েছে।'

হেরম্ব বলল, 'মনে করার কি আছে!'

মালতীর মুখ দেখে হেরম্বের মনে হল তাকে সমালোচনা করে এভাবে অতিথিকে মান না দিলেই অনাথ ভাল করত।

অনাথ বলল, 'আমার চাদরটা কোথায় রে আনন্দ?'

'আলনায় আছে—মার ঘরে। এনে দেব?'

'থাক। আমিই নিচ্ছি গিয়ে।···তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলার সুযোগ হল না বলে অনাদর মনে করে নিও না হেরম্ব। আমার

মনটা আজ একটু বিচলিত হয়ে পড়েছে। আসনে না বসলে স্বস্তি পাব না।'

হেরম্ব বলল, 'তা হোক মাষ্টারমশায়। আর একদিন কথাবার্তা হবে।'

মালতী মুখ গোঁজ করে বসেছিল। এইবার সে জিজ্ঞাসা করল, 'চাদর দিয়ে হবে কি?'

অনাথ বলল, 'পেতে আসন করব। আসনটা লুকিয়ে তুমি ভালই করেছ মালতী। দশ বছর ধরে ব্যবহার করে আসনটাতে কেমন একটু মায়া বসে গিয়েছে। একটা জড় বস্তুকে মায়া করা থেকে তোমার দয়াতে উদ্ধার পেলাম।'

মালতী নিশ্বাস ফেলে বলল, 'যা আনন্দ, আমার বিছানার তলা থেকে আসনটা বার করে দিবি যা।'

অনাথ বলল, 'থাক্, কাজ নেই। ও আসনে আমি আর বসব না।'

মালতী ক্রোধে আরক্ত মুখ তুলে বলল, 'তুমি মানুষ নও। জানলে? মানুষ তুমি নও! তুমি ডাকাত! তুমি ছোটলোক!'

'রেগো না মালতী। রাগতে নেই।'

'রাগতে নেই, রাগতে নেই! আমার খাবে পরবে, আমাকেই অপমান করবে,—রাগতে নেই!'

'মাথা গরম করা মহাপাপ মালতী।'—মৃদুস্বরে এই কথা বলে অনাথ বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।

খানিকক্ষণ নিঝুম হয়ে থেকে মালতী হঠাৎ তার শাব্দিত হাসি হেসে বলল, 'দেখলে হেরম্ব? লোকটা কেমন পাগল দেখলে?'

হেরম্ব অস্বস্তি বোধ করছিল। বলল, 'আমি কি বলব বলুন!'

আনন্দ বলল, 'বাইরের লোকের সামনেও ঝগড়া করে ছাড়লে তো মা?'

মালতী বলল, 'হেরম্ব বাইরের লোক নয়।'

হেরম্বও এ কথায় সায় দিয়ে বলল, 'না। আমি বাইরের লোক নই আনন্দ।'

আনন্দ বলল, 'তা জানি। বাইরের লোকের সঙ্গে মা ঠাট্টা-তামাসা করে না। প্রথম থেকে মা আপনার সঙ্গে যেরকম পরিহাস করছিল, তাতে বাইরের লোক হওয়া দূরে থাক, আপনি ঘরের লোকের চেয়ে বেশী, প্রমাণ হয়ে গেছে।'

মালতী বলল, 'ঘরের লোকের সঙ্গে আমি খুব ঠাট্টা-তামাসা করি, নারে আনন্দ? তামাসা করার কত লোক ঘরে! একটা কথা কওয়ার লোক আছে আমার?'

আনন্দ হাতের তালু দিয়ে আস্তে আস্তে তার পিঠ ঘষে দিতে দিতে বলল, 'ঘরে নাই বা লোক রইল মা, তোমার কাছে বাইরের কত লোক আসে, সমস্ত সকালটা তুমি তাদের সঙ্গে কথা কও।'

পিঠ থেকে মেয়ের হাত সামনে এনে মালতী বলল, 'তারা হল ভক্ত, লক্ষ্মীছাড়ার দল। ওদের ঠকাতে ঠকাতেই প্রাণটা আমার বেরিয়ে গেল না! খাচ্ছিস্ দাচ্ছিস্, মনের সুখে আছিস্, লোককে ঠকিয়ে পয়সা করতে কেমন লাগে তুই তার কি বুঝবি! সারা সকালটা গম্ভীর হয়ে বসে বসে শুধু ভাব, কি করে কার কাছে দুটো পয়সা বেশী আদায় হবে। আমি মেয়েমানুষ আমার কি ওসব পোষায়? তোর বাপ একটা

পয়সা রোজগার করে ? একবার ভাবে, দিন গেলে পোড়া পেটের পিণ্ডি কোথা থেকে আসে ? তুই ভাবিস্!’

আনন্দ অনুযোগ দিয়ে বলল, ‘ওঁর কাছে তুমি সব প্রকাশ করে দিচ্ছ মা।’

এই অভিযোগে মালতী কিছুমাত্র বিচলিত হল না, বলল, ‘তাতে কি, যা করছি জেনে শুনেই করছি। হেরম্ব লুকোচুরি ভালবাসে না।’

এই ব্যাখ্যা অথবা কৈফিয়ৎ হেরম্বের মনে লাগল। সে বুঝতে পারল, তার মতামতকে অগ্রাহ্য করে বলে নয়, শেষপর্য্যন্ত তার কাছে কোন কথাই লুকানো থাকবে না বলেই মালতী কোন বিষয়ে লুকোচুরির আশ্রয় গ্রহণ করছে না। নিজের এবং নিজেদের সঠিক পরিচয় আগেই তাকে জানিয়ে রাখছে।

এর মধ্যে আরও একটা বড় কথা ছিল, হেরম্বকে যা পুলকিত করে দিল। মালতী আশা করে আজই শেষ নয়, সে আসা-যাওয়া বজায় রাখবে। ভূমিকাতেই তার সামনে নিজের সব দুর্ব্বলতা ধরে দিয়ে মালতী শুধু এই সম্ভাবনাই রহিত করে দিচ্ছে যে ভবিষ্যতে তার যেন আবিষ্কার করার কিছুই না থাকে। হেরম্বের মনে হল এ যেন একটা আশ্বাস, একটা কাম্য ভবিষ্যৎ। সে বারবার আসবে এবং তাদের সঙ্গে এতদূর ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠবে যে মালতীর খাপছাড়া জীবনের সমস্ত দীনতা ও অসঙ্গতি সে জেনে ফেলবে, মালতীর এই প্রত্যাশা নানা সম্ভাবনায় হেরম্বের কাছে বিচিত্র ও মনোহর হয়ে উঠল। মালতীর এই মৌলিক আমন্ত্রণে তার হৃদয় কৃতজ্ঞ ও প্রফুল্ল হয়ে রইল।

'একথা মিথ্যা নয় মালতী-বৌদি। আমার কাছে কিছুই গোপন করবার দরকার নেই।'

'গোপন করার কিছু নেই-ও হেরম্ব।'

'কি থাকবে?'

'তাই বলছি। কিছুই নেই।'

একটা যেন চুক্তি হয়ে গেল। মালতী স্বীকার করল সে কারণ পান করে, লোকঠকানো পয়সায় জীবিকা নির্ব্বাহ করে। হেরম্ব ঘোষণা করল, তাতে কিছু এসে যায় না।

জীবন মালতীকে অনেক শিক্ষা দিয়েছে। হয়ত সে শিক্ষা হৃদয়-সংক্রান্ত নয়। কিন্তু তার তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে সন্দেহ করা চলে না।

কিন্তু আনন্দ?

আনন্দের হৃদয় কি প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও মার্জ্জনা পায় নি? ওর জমকালো বাইরের রূপ তো ওর হৃদয়কে ছাপিয়ে নেই?—হেরম্ব এই কথা ভাবে। মালতী যে মেয়েকে কুশিক্ষা দেবে তার এ আশঙ্কা কমে এসেছিল। সে ভেবে দেখেছে, মালতী ও আনন্দের জীবন এক নয়। যে সব কারণ মালতীকে ভেঙ্গেছে, আনন্দের জীবনে তার অস্তিত্ব হয়ত নেই। তাছাড়া ওদিকে আছে অনাথ। ~~মেয়েরা মার চেয়ে পিতাকেই নকল করে বেশী, পিতার শিক্ষাই মেয়েদের জীবনে বেশী কার্য্যকরী হয়।~~ অনাথের প্রভাব আনন্দের জীবনে তুচ্ছ হতে পারে না। মালতীর সঙ্গে পরিচয় করে মানুষ যে আজকাল খুসী হতে পারে না, অনাথ সমুদ্রতীরে একথা স্বীকার করেছে। অনাথের যদি এই জ্ঞান জন্মে থাকে, মেয়ের সম্বন্ধে সে কি সাবধান হয় নি?

অনাথ ওস্তাদ কারিকর, হৃদয়ের প্রতিভাবান শিল্পী। আনন্দ হয়ত তারই হাতে গড়া মেয়ে। হয়ত মালতীর বিরুদ্ধ প্রভাবকে অনাথের সাহায্যে জয় করে করে তার হৃদয়-মনের বিকাশ আরও বিচিত্র, আরও অনুপম হয়েছে। ঘরে বসে হৃদয়ের দলগুলি মেলবার উপায় মানুষের নেই, মনের সামঞ্জস্য ঘরে সঞ্চয় করা যায় না। মন্দের সম্পর্কে না এলে ভাল হওয়া কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। (জীবনের রুক্ষ কঠোর আঘাত না পেলে মানুষ জীবনে পঙ্গু হয়ে থাকে, তরল পদার্থের মত তার কোন নিজস্ব গঠন থাকে না।) আনন্দ হয়ত মালতীর ভিতর দিয়ে পৃথিবীর পরিচয় পেয়ে সম্পূর্ণতা অর্জ্জন করেছে। টবের নিস্তেজ অসুস্থ চারাগাছ হয়ে থাকার বদলে মালতীর সাহায্যেই হয়ত সে পৃথিবীর মাটিতে আশ্রয় নেবার সুযোগ পেয়েছে, রোদ বৃষ্টি গায়ে লাগিয়ে আগাছার সঙ্গে লড়াই করে ও মাটির রস আকর্ষণ করে বেড়ে ওঠা তরুর মত সতেজ, সজীব জীবন আহরণ করতে পেরেছে।

কিছুক্ষণের জন্য তিনজনেই নির্ব্বাক হয়ে গিয়েছিল। অনাথের কিছু দরকার আছে কিনা দেখতে গিয়ে আনন্দ সমস্ত মুখ ভাল করে ধুয়ে এসেছে। হেরম্বের দৃষ্টিকে চোখে না দেখেও তার মুখে যে অল্প অল্প রক্তের ঝাঁঝ ও রঙ সঞ্চারিত হচ্ছিল বোধ হয় সেইজন্যই। তবে আনন্দের সম্বন্ধে কোন বিষয়ে নিঃসন্দেহ হবার সাহস হেরম্বের ছিল না। তার যতটুকু বোধগম্য হয় আনন্দের প্রত্যেকটি কথা ও কাজের যেন তারও অতিরিক্ত অনেক অর্থ আছে।

আনন্দ বলল, 'আজ আরতি হবে না মা?'

'হবে।'

'এখনো যে মন্দিরের দরজাই খুললে না?'

'তোর বুঝি খিদে পেয়েছে? প্রসাদের অপেক্ষায় বসে না থেকে কিছু খেয়ে তো তুই নিতে পারিস আনন্দ?'

'খিদে পায় নি মা। খিদে পেলেও আজ খাচ্ছে কে?'

মালতী তার মুখের দিকে তাকাল।

'কেন, খাবি না কেন? নাচবি বুঝি আজ?'

আনন্দ মৃদু হেসে বলল, 'হ্যাঁ। এখন নয়। চাঁদ উঠুক, তারপর।'

'আজ আবার তোর নাচবার সাধ জাগল! তোকে নাচ শিখিয়ে ভাল করি নি আনন্দ। রোজ রোজ না খেয়ে—'

আনন্দ নিরতিশয় আগ্রহের সঙ্গে বলল, 'অনেক রাত্রে আজ চন্দ্রকলা নাচটা নাচব মা।'

'তারপর রাত্রে না খেয়ে ঘুমোবি তো?'

'ঘুমোলাম বা! একরাত না খেলে কি হয়? আজ পূর্ণিমা তা জান?'

মালতী বলল, 'আজ পূর্ণিমা নাকি? তাই কোমরটা টন্ টন্ করছে, গা ভারি ঠেকছে!'

হেরম্ব কৌতূহলের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি নাচতে পার নাকি আনন্দ?'

মালতী বলল, 'পারবে না? আর কিছু শিখেছে নাকি মেয়ে আমার। গুণের মধ্যে ওই এক গুণ—নাচতে শিখেছেন। দুটি লোকের রান্না করতে দাও—মেয়ে চোখে অন্ধকার দেখবেন!'

আনন্দ হেসে বলল, 'মিথ্যে আমার নিন্দা কোরো না মা। বাবাকে দু'বেলা রেঁধে দেয় কে?'

'যে রান্নাই রেঁধে দিস্‌, ও তোর বাপ ছাড়া আর কেউ মুখেও করবে না।'

'তা হতে পারে। কিন্তু রাঁধি ত! বসে বসে খাই আর নাচি, একথা বলতে হয় না।'

হেরম্ব বলল, 'আমি তোমার নাচ দেখতে পারি আনন্দ?'

'খুব। কেন পারবেন না? এতো থিয়েটারের নাচ নয় যে দেখতে পয়সা লাগবে! কিন্তু আপনি কি অতক্ষণ থাকবেন?'

'থাকতে দিলেই থাকব।'

মালতী বলল, 'থাকবে বৈকি। তুমি আজ এখানেই খাবে হেরম্ব।'

আনন্দ হেসে বলল, 'নেমন্তন্ন তো করলে, ঘরের লোকটিকে খাওয়াবে কি মা?'

'আমরা যা খাই তাই খাবে।'

'তার মানে উপোস। আজ পূর্ণিমার রাত, তুমি একটু দুধ খাবে, আমি কিছুই খাব না। অতিথিকে খাওয়াবার বেশ ব্যবস্থাই করলে মা।'

মালতী বলল, 'তোর কথার, জানিস আনন্দ, ছিরিছাঁদ নেই। আমরা খাই বা না খাই একটা অতিথির পেট ভরাবার মত খাবারও ঘরে নেই নাকি!'

আনন্দ মুচকে হেসে বলল, 'তাই বল! আমরা যা খাব ওঁকেও তাই খেতে হবে বললে কিনা, তাই ভাবলাম ওঁর জন্যেও বুঝি উপোসের ব্যবস্থা হচ্ছে।'

হেরম্ব ভাবে, মাকে মধ্যস্থ রেখে আমার সঙ্গে আলাপ করা কেন? এতক্ষণ যত কথা বলেছে সব আমাকে শোনাবার জন্য, কিন্তু নিজে থেকে

সোজাসুজি আনন্দ আমাকে একটা কথাও বলে নি। আমার প্রশ্নের জবাব দিয়েছে, আমার কথার পিঠে দরকারী কথাও চাপিয়েছে কিন্তু আমাকে এখন পর্য্যন্ত কিছু জিজ্ঞাসা করে নি। আমার সম্বন্ধে ওর যে বিন্দুমাত্র কৌতূহল আছে তার নিরীহতম প্রকাশটিকেও অনায়াসে সংযত করে চলেছে। আমাকে এভাবে অবহেলা দেখানোর মানে কি? আমাকে একটা নিজস্ব ছোট্ট প্রশ্ন ওতো অনায়াসে করতে পারে, একটা বাজে অবান্তর প্রশ্ন!

'আপনি কি ভাবছেন?'

হেরম্ব চমকে উঠে ভাবল, মনের প্রার্থনা আমি তো উচ্চারণ করে বসি নি! তাকে অত্যন্ত চিন্তিত ও অন্যমনস্ক দেখে আনন্দ এই প্রশ্ন করেছিল, তার অপ্রকাশিত মনোভাবকে অনুমান করে নয়। এর চেয়ে বিস্ময়কর যোগাযোগও পৃথিবীতে ঘটে থাকে। কিন্তু হেরম্বের মনে হল, একটা অঘটন ঘটে গেছে, এই নিয়মচালিত জগতে একটা অত্যাশ্চর্য্য অনিয়ম। সে খুসী হয়ে বলল, 'ভাবছি, তুমি আমার মনের কথা জানলে কি করে।'

আনন্দ ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল, 'আপনার মনের কথা কখন জানলাম?'

'এইমাত্র।'

'কি বলছেন, বুঝতে পারছি না।'

মালতী বলল, 'হেঁয়ালি করছে গো, হেঁয়ালি করছে।'

'হেঁয়ালি করছেন?'

হেরম্ব অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'না। হেঁয়ালি করি নি।'

'তবে ও কথা বললেন কেন, আপনার মনের কথা জেনেছি?'

'এমনি বলেছি। রহস্য করে।'

'এ কিরকম দুর্ব্বোধ্য রহস্য! আমি ভাবলাম, একটা কিছু মজার কথা বুঝি আপনার মনে হয়েছে, এটা তার ভূমিকা। শেষে ব্যাখ্যা করে আমাদের হাসিয়ে দেবেন।'

হেরম্ব ইতিমধ্যে আত্মসম্বরণ করেছে।

'তাই মনে ছিল আনন্দ। শেষে ভেবে দেখলাম, ব্যাখ্যা না করেই হাসিয়ে দেওয়া ভাল।'

'এটা এখুনি বানিয়ে বললেন।'

'নিশ্চয়। সঙ্গে সঙ্গে না বানাতে পারলে চলবে কেন? হাসির কথা আধমিনিটে পচে যায়।'

'আর হাসি? হাসি কতক্ষণে পচে যায়? আপনার কথাটা শুনে এমন সব অদ্ভুত কথা মনে হচ্ছে! আচ্ছা, আপনি কখনো ভেবেছেন হাসতে হাসতে মানুষ হঠাৎ কেন থেমে যায়? সিদ্ধি খেয়ে যারা হাসে তাদের কথা বলছি না। যারা হঠাৎ খুসী হয়ে হাসে,—মজার কথায় হোক, হাসির ব্যাপারে হোক অথবা আনন্দ পেয়েই হোক। হাসতে আরম্ভ করলেই মানুষের এমন কি কথা মনে পড়ে যায়, যার জন্য আস্তে আস্তে হাসি থেমে আসে? তাছাড়া এমন মজা দেখুন, পাগল না হলে মানুষ একা একা হাসতে পারে না। হাসতে হলে কম করে অন্ততঃ দু'জন লোক থাকা চাই। ঘরের কোণে বসে নিজের মনে যদিই বা কেউ কখনো হাসে, তার তখন নিশ্চয়ই এমন একটা কথা মনে পড়েছে যার সঙ্গে অন্য একজন লোকের সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। নিছক নিজের কথা নিয়ে কেউ হাসে না। হাসে?'

'না।'

'খুব আশ্চর্য্য না ব্যাপারটা? হাসির কথা পড়লে কিম্বা শুনলে মানুষ হাসবে,—কেউ হাসাবে তবে! হাসবার মত কিছু হাতের কাছে না থাকলে কেউ মরলেও হাসতে পারবে না। হাসির উপলক্ষটা সব সময় থাকবে বাইরে, আবার তা থেকে তার নিজেকে বাদ থাকতে হবে। এসব কথা ভাবলে আমি একেবারে আশ্চর্য্য হয়ে যাই। হাসি এমন ভাল জিনিষ, নিজের জন্য কেউ নিজে তা তৈরী করতে পারবে না! সাধে কি মানুষ দিনরাত মুখ গোঁজ করে থাকে। মাঝে মাঝে একটু একটু না হেসে মানুষ যদি সব সময় হাসতে পারতো!'

মালতী বলল, 'তোর আজ কি হয়েছে রে আনন্দ? এত কথা কইছিস যে?'

আনন্দ বলল, 'বেশী কথা বলছি? বলব না! তোমরা থাকবে যে যার তালে, চুপ করে থেকে আমার এদিকে কথা জমে জমে হিমালয় পাহাড়! সুযোগ পেলে বলব না বেশী কথা?'

'তুই আজ নিশ্চয় চুরি করে কারণ খেয়েছিস!'

'না গো না', চুরি করে ছাইপাঁশ খাবার মেয়ে আমি নই। মনের স্ফূর্ত্তির জন্য আমার কারণ খেতে হয় না।'

হেরম্বের কাছে এইটুকু গর্ব্ব প্রকাশ করেই আনন্দ বোধ হয় নিজেকে এত বেশী প্রকাশ করা হয়েছে বলে মনে করে যে, কিছুক্ষণের জন্য মালতীর দেহের আড়ালে নিজেকে সে প্রায় সম্পূর্ণ লুকিয়ে ফেলে। অথচ এ

কাজটা সে এমন একটি ছলনার আশ্রয়ে করে যে মালতী বুঝতে পারে না, হেরম্ব বুঝতে ভরসা পায় না।

মালতী বলে, 'কোমর টন্‌টন্ করছে বলে তোকে আমি টিপতে বলি নি আনন্দ! এম্‌নি টিপুনিতে যদি ব্যথা কমত তবে আর ভাবনা ছিল না।'

হেরম্ব শুধু আনন্দের পায়ের পাতা দুটি দেখতে পায়। আঙুল বাঁকিয়ে আনন্দ পায়ের নখ সিঁড়ির সিমেণ্টে একটা খাঁজে আট্‌কেছে। হেরম্বের মনে হয়, আনন্দের আঙুলে ব্যথা লাগছে। এভাবে তার নিজেকে ব্যথা দেবার কারণটা সে কোনমতেই অনুমান করতে পারে না। সিমেণ্টের খাঁজ থেকে আনন্দের আঙুল ক'টিকে মুক্ত করে দেবার জন্য তার মনে প্রবল আগ্রহ দেখা দেয়। একটি নিরীহ ছোট কালো পিঁপড়ে, যারা কখনো কামড়ায় না কিন্তু একটু ঘসা পেলেই নিশ্চিহ্ন হয়ে প্রাণ দেয়, সেই জাতের একটি অতি ছোট পিঁপড়ে, আনন্দের আঙুলে উঠে হেরম্বের চেতনায় নিজের ক্ষীণতম অস্তিত্বকে ঘোষণা করে দেয়। হেরম্ব তাকে স্থানচ্যুত করতে গিয়ে হত্যা করে ফেলে।

আনন্দ বলে, 'কি?'

'একটা পোকা।'

'কি পোকা?'

'বিষপিঁপড়ে বোধ হয়।'

মালতী বলে, 'একটা বিষপিঁপড়ে তাড়াতে তুমি ওর পায়ে হাত দিলে!—আহা কি করিস আনন্দ, করিস নে, পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করিস নে। কুমারীর কাউকে প্রণাম করতে নেই জানিস নে তুই?'

আনন্দ হেরম্বকে প্রণাম করে বলল, 'তোমার ওসব অদ্ভুত তান্ত্রিক মত আমি মানি না মা।'

হেরম্বের আশঙ্কা হয় মেয়ের অবাধ্যতায় মালতী হয়ত রেগে আগুন হয়ে উঠবে। কিন্তু তার পরিবর্তে মালতীর দুঃখই উথলে উঠল।

'আগেই জানি কথা শুনবে না! এ বাড়ীতে কেউ আমার কথা শোনে না হেরম্ব। আমি এখানে দাসী-বাঁদীরও অধম। বল্‌ত ওর বাপ, দেখতে কথা শোনার কি ঘটা মেয়ের! আমি তুচ্ছ মা বই তো নই।'

তার এই সকরুণ অভিযোগে হেরম্বের সহানুভূতি জাগে না। আনন্দ মার অবাধ্য জেনে সে খুসীই হয়ে ওঠে। আনন্দ বাপের দুলালী মেয়ে এ যেন তারই ব্যক্তিগত সৌভাগ্য। আনন্দের সম্বন্ধে প্রথমে তার যে আশঙ্কা জেগেছিল এবং পরে যে আশা করে সে এই আশঙ্কা কমিয়ে এনেছিল, তাদের মধ্যে কোন্‌টি যে বেশী জোরালো এতক্ষণ হেরম্ব তা বুঝতে পারে নি। অনাথ এবং মালতী এদের মধ্যে কাকে আশ্রয় করে আনন্দ বড় হয়েছে সঠিক না জানা অবধি স্বস্তি পাওয়া হেরম্বের পক্ষে অসম্ভব ছিল। আনন্দের অন্তর অন্ধকার, এর ক্ষীণতম সংশয়টিও হেরম্বের সহ্য হচ্ছিল না। মালতীর আদেশের বিরুদ্ধেও তাকে প্রণাম করার মধ্যে তার প্রতি আনন্দের যতটুকু শ্রদ্ধা প্রকাশ পেল, হেরম্ব সেটুকু তাই খেয়াল করারও সময় পেল না। মালতীকে আনন্দ নকল করে নি শুধু এইটুকুই তার কাছে হয়ে রইল প্রধান। আনন্দের অকারণ ছেলেমানুষী ঔদ্ধত্যে তার দুঃস্বপ্নের ঘোর কেটে গেছে।

আনন্দকে চোখে দেখে হেরম্বের মনে যে আবেগ ও মোহ প্রথমেই সঞ্চারিত হয়েছিল এতক্ষণে তার মনের সর্বত্র তা সঞ্চারিত হয়ে তার

সমস্ত মনোধর্ম্মকে আশ্রয় করেছিল। নিজেকে অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত ও মুগ্ধ অবস্থায় আবিষ্কার করার বিস্ময় অপনোদিত হয়ে গিয়েছিল। তার মন সেই স্তরে উঠে এসেছিল যেখানে আনন্দের অনির্ব্বচনীয় আকর্ষণ চিরন্তন সত্য। আনন্দকে চোখে দেখা ও তার কথা শোনা হেরম্বের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। নেশা জমে এলে যেমন মনে হয় এই নেশার অবস্থাটিই সহজ ও স্বাভাবিক, আনন্দের সান্নিধ্যে নিজের উত্তেজিত অবস্থাটিও হেরম্বের কাছে তেমনি অভ্যস্ত হয়ে এসেছিল। আনন্দ এখন তাকে আবার নতুন করে মুগ্ধ ও বিচলিত করে দিয়েছে। বয়স্ক হেরম্বের মনেও যে লোকটি এক রহস্যময় মায়ালোকবাসী হয়ে আছে নিজেকে সেই অনাথের অনুরক্তা কন্যা বলে ঘোষণা করে আনন্দ তার আবিষ্ট মোহাচ্ছন্ন মনের উন্মাদনা আরও তীব্র আরও গভীর করে দিয়েছে।

প্রেমিকের কাছে প্রেমের অগ্রগতির ইতিহাস নেই। যতদূরই এগিয়ে যাক সেইখান থেকেই আরম্ভ। আগে কিছু ছিল না। ছিল অন্ধকারের সেই নিরন্ধ্র কুলায়, যেখানে নব জন্মলাভের প্রতীক্ষায় কঠিন আস্তরণের মধ্যে হৃদয় নিস্পন্দ হয়ে ছিল। হেরম্ব জানে না তার আকুল হৃদয়ের আকুলতা বেড়েছে, এ শুধু বৃদ্ধি, শুধু ঘন হওয়া। আনন্দের অস্তিত্ব এইমাত্র তার কাছে প্রকাশ পেয়েছে, এতক্ষণে ওর সম্বন্ধে সে সচেতন হল। এক মুহূর্ত্ত আগে নয়।

এক মুহূর্ত্ত আগে তার হৃৎপিণ্ড স্পন্দিত হচ্ছিল কেবল শিরায় শিরায় রক্ত পাঠাবার প্রাত্যহিক প্রীতিহীন প্রয়োজনে। এইমাত্র আনন্দ তার স্পন্দনকে অসংযত করে দিয়েছে।

খানিক পরে মালতী উঠে দাঁড়াল।

আনন্দ বলল, 'কোথায় যাচ্ছ মা ?'

'গা ধুতে হবে না, আরতি করতে হবে না ? সন্ধ্যা হল, সে খেয়াল আছে !'

গোধূলি লগ্নে হেরম্বের কাছে আনন্দকে ফেলে মালতী উঠে চলে গেল।

পৃথিবী জুড়ে নয়, এইখানে সন্ধ্যা নামছে। পৃথিবীর আর এক পিঠে এখন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সমগ্রভাবে বিস্তৃত চলমান অবিচ্ছিন্ন দিন। এখানে যে রাত্রি আসছে তাকে নিজের দেহ দিয়ে সৃষ্টি করেছে মাটির পৃথিবী। পৃথিবী থেকে সূর্য্য যতদূর, মহাশূন্যে রাত্রির বিস্তার তার চেয়েও অনন্তগুণ বেশী। রাত্রির অন্ত নেই। মধ্যরাত্রিকে অবলম্বন করে কল্পনায় যতদূর খুসী চলে যাওয়া যাক, রাত্রির শেষ মিলবে না। পৃথিবীর এক পিঠে যে আলো ধরা পড়ে দিন হয়েছে, অসীম শূন্যের শেষ পর্য্যন্ত তার অভাব কোথাও মেটে নি।

মালতী চলে গেলে মুখ তুলে আকাশের দিকে একবার তাকিয়ে হেরম্বের মনে যে কল্পনা দেখা দিয়েছিল উপরের কথাগুলি তারই ভাষান্তরিত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। আনন্দের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এ তার ক্ষণিকের বিশ্রাম মাত্র। মালতীর অন্তরাল সরে যাওয়ায় আনন্দ যে নিজেকে অনাবৃত ও অসহায় মনে করছে হেরম্বের তা বুঝতে বাকী থাকে নি। চোখের সামনে ধূসর আকাশটি থাকায় আকাশকে উপলক্ষ করেই সে তাই কথা আরম্ভ করল। আকাশ থেকে কথা পৃথিবীতে নামতে নামতে আনন্দ তার লজ্জা ও সঙ্কোচকে জয় করে নেবে।

'ক'টা তারা উঠেছে বল তো আনন্দ ?'

'ক'টা ? একটা দেখতে পাচ্ছি। না, দুটো।'

'দুটো তারা দেখতে পেলে কি যেন হয় ?'

'কি হয় ? তারার মত চোখের জ্যোতি বাড়ে ?'

আনন্দের কণ্ঠস্বর পরিবর্ত্তিত হয়ে গেছে। সে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে তার পায়ের নখের দিকে।

অবান্তর কথা বেশীক্ষণ চলে না। আনন্দই প্রথমে আলাপকে তাদের স্তরে নামিয়ে আনল।

'বাবা বললেন, আপনি কলেজে পড়ান। আপনি খুব পড়াশোনা করেন বুঝি ?'

'না। পড়া হল পরের ভাবনা ভাবা। তার চেয়ে নিজের ভাবনা ভাবতেই আমার ভাল লাগে। তুমি বুঝি বাবার কাছে আমার কথা সব জেনে নিয়েছ ?'

'সব। শুধু বাবার কাছে জানি নি, মা জল দিতে ডাকা পর্য্যন্ত ওই জানালায় দাঁড়িয়ে মার সঙ্গে আপনার যত কথা হয়েছে সব শুনে ফেলেছি।'

আনন্দ চোখ তুলল। কিন্তু এখনো সে হেরম্বের দিকে তাকাতে পারছে না।

'শুনে কি মনে হল ?'

আনন্দ হঠাৎ জবাব দিল না। তারপর সঙ্কোচের সঙ্গে বলল, 'মনে হল খুব নিষ্ঠুরের মত স্ত্রীর কথা বললেন। আপনার স্ত্রী কতদিন মারা গেছেন ?'

হেরম্ব বলল, 'অনেক দিন। প্রায় দেড়বছর।'

আনন্দ হেরম্বের জামার বোতামের দিকে তাকিয়ে বলল, 'অনেক দিন বললেন যে? দেড়বছর কি অনেক দিন?'

হেরম্ব বলল, 'অনেক দিন বৈকি। দেড়বছরে ক'বার সূর্য্য ওঠে, কত লোক জন্মায়, কত লোক মরে যায় খবর রাখ?'

আনন্দ মনে মনে একটু হিসাব করে বলল, 'দেড়বছরে সূর্য্য ওঠে পাঁচশো সাতচল্লিশ বার। লোক জন্মায় কত? কত লোক মরে যায়?'

হেরম্ব হেসে বলল, 'পনের কুড়ি লাখ করে হবে।'

আনন্দও তার চোখের দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'মোটে? আমি ভাবছিলাম একবছরে পৃথিবীতে বুঝি কোটি কোটি লোক জন্মায়। মার কাছে রোজ যে সব মেয়ে ভক্ত আসে তাদের সকলেরই বুকে একটি, কাঁখে একটি, হাত-ধরা একটি, এমনি গাদা গাদা ছেলেমেয়ে দেখি কিনা, তাই মনে হয় পৃথিবীতে রোজ বুঝি অগুন্তি ছেলেমেয়ে জন্মাচ্ছে। কিন্তু দেড়বছরে আর যাই হোক, মানুষ কি বদলাতে পারে?'

'পারে। এক মিনিটে পারে।' হেরম্ব জোর দিয়ে বলল।

আনন্দ একটু লাল হয়ে বলল, 'আপনার স্ত্রীর কথা ভেবে বলি নি। এমনি সাধারণ ভাবে বলেছি।'

দেড়বছরে মানুষ বদলাতে পারে কিনা প্রশ্ন করে তার মনে স্ত্রীর শোকটা কতখানি বর্ত্তমান আছে আনন্দ তাই মাপতে চেয়েছিল হেরম্ব একথা বিশ্বাস করে নি। সে জেনেছে আনন্দের হৃদয়ে মানুষের সহজ অনুভূতিগুলি সহজ হয়েই আছে। মৃতা স্ত্রীকে কেউ ভুলে গেছে শুনলে খুসি হবার মত হিংস্র আনন্দ নয়।

কিন্তু আনন্দকে মিথ্যা কথা শোনানও হেরম্বের পক্ষে অসম্ভব।

'আমার স্ত্রীর কথা ভেবে বললেও দোষ হত না আনন্দ। সংসারে কত পরিচিত লোক কত আত্মীয় থাকে, যারা হঠাৎ আমাদের ছেড়ে চলে যায়। বেঁচে থাকবার সময় আমাদের কাছে তাদের যতটুকু দাম ছিল, মরে যাবার পর কেবল কাছে নেই বলেই তাদের সে দাম বাড়িয়ে দেওয়া উচিত নয়। দিলে মরণকে আমরা ভয় করতে আরম্ভ করব। আমাদের জীবনে মৃত্যুর ছায়া পড়বে। আমরা দুর্ব্বল অসুস্থ হয়ে পড়ব।'

'কিন্তু—' বলে আনন্দ চুপ করে গেল।

হেরম্ব বলল, 'তুমি যা খুসী বলতে পার আনন্দ, কোন বাধা নেই।'

'কথাগুলির মধ্যে আপনার স্ত্রী এসে পড়ছেন বলে সঙ্কোচ হচ্ছে। যাই হোক, বলি। মনের কথা চেপে রাখতে আমার বিশ্রী লাগে। আমার মনে হচ্ছে আপনার কথা ঠিক নয়। ভালবাসা থাকলে শোক হবেই। শোক মিথ্যে হলে ভালবাসাও মিথ্যে।'

হেরম্ব খুসী হল। প্রতিবাদ তার ভাল লাগে। প্রতিবাদ খণ্ডন করা যেন একটা জয়ের মত।

'ভালবাসা থাকলে শোক হয় আনন্দ। কিন্তু ভালবাসা কতদিনের? কতকাল স্থায়ী হয় ভালবাসা? প্রেম অসহ্য প্রাণঘাতী যন্ত্রণার ব্যাপার। প্রেম চিরকাল টিঁকলে মানুষকে আর টিঁকতে হত না। প্রেমের জন্ম আর মৃত্যুর মধ্যে ব্যবধান বেশী নয়। প্রেম যখন বেঁচে আছে তখন দু'জনের মধ্যে একজন মরে গেলে শোক হয়,—অক্ষয় শোক হয়। প্রেমের অকালমৃত্যু নেই বলে শোকের মধ্যে প্রেম চিরন্তন হয়ে যায়।

কিন্তু প্রেম যখন মরে গেছে, যখন আছে শুধু মায়া, অভ্যাস আর আত্মসান্ত্বনার খেলা, তখন যদি দু'জনের একজন মরে যায়, বেশীদিন শোক হওয়া অসুস্থ মনের লক্ষণ। সেটা দুর্ব্বলতা আনন্দ। তুমি রোমিও জুলিয়েটের গল্প জান?'

'জানি। বাবার কাছে শুনেছি।'

'প্রেমের মৃত্যু হবার আগেই ওরা মরে গিয়েছিল। একসঙ্গে দু'জনে মরে না গিয়ে ওদের মধ্যে একজন যদি বেঁচে থাকত, তার শোক কখনো শেষ হত না। কিন্তু কিছুকাল বেঁচে থেকে ক্রমে ক্রমে ভালবাসা মরে যাওয়ার পর ওদের মধ্যে একজন যদি স্বর্গে যেত, পৃথিবীতে যে থাকত চিরকাল তার শোকাতুর হয়ে থাকার কোন কারণ থাকত না। একটা ব্যাপার তুমি লক্ষ্য করেছ আনন্দ? রোমিও জুলিয়েটের ট্র্যাজেডি তাদের মৃত্যুতে নয়?'

'কিসে তবে?'

'ওদের প্রেমের অসমাপ্তিতে। রোমিও জুলিয়েটের কোন দাম মানুষের কাছে নেই। জগতে লক্ষ লক্ষ রোমিও জুলিয়েট মরে যাক, কিছু এসে যায় না। কিন্তু ওভাবে ভাল বাসতে বাসতে ওরা মরল কেন ভেবেই আমাদের চোখে জল আসে।'

আনন্দ আনমনে বলল, 'তাই কি? তা হবে বোধ হয়!'

হেরম্ব জোর দিয়ে বলল, 'হবে বোধ হয় নয়, তাই। ওদের অসম্পূর্ণ প্রেমকে আমরা মনে মনে সম্পূর্ণ করবার চেষ্টা করে ব্যথা পাই—রোমিও জুলিয়েটের ট্র্যাজেডি তাই। নইলে, ওদের জীবনে ট্র্যাজেডি কোথায়? ওরা দু'জনেই মরে গিয়ে সব কিছুরই অতীত হয়ে গেল—ওদের জীবনে

দুঃখ সৃষ্টি হবার সুযোগও ছিল না। আমরা সমবেদনা দেব কাকে? কিসের জোরে রোমিও জুলিয়েট আমাদের একফোঁটা অশ্রু দাবী করবে? ওরা তো দুঃখ পায় নি। প্রেমের পরিপূর্ণ বিকাশের সময় ওরা দুঃখকে এড়িয়ে চলে গেছে। আমরা ওদের প্রেমের জন্য শোক করি, ওদের জন্য নয়।'

আনন্দ বলল, 'প্রেম কতদিন বাঁচে?'

হেরম্ব হেসে বলল, 'কি করে বলব আনন্দ! দিন গুণে বলা যায় না। বে বেশীদিন নয়। এক দিন, এক সপ্তাহ, বড়জোর এক মাস।'

শুনে আনন্দ যেন ভীতা হয়ে উঠল।

'মোটে?'

হেরম্ব আবার হেসে বলল, 'মোটে হল? একমাসের বেশী প্রেম কারো সহ্য হয়? মরে যাবে আনন্দ—একমাসের বেশী হৃদয়ে প্রেমকে পুষে রাখতে হলে মানুষ মরে যাবে। মানুষ একদিন কি দু'দিন মাতাল হয়ে থাকতে পারে। জলের সঙ্গে মদের যে সম্পর্ক মদের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক তাই,—প্রেম এত তেজী নেশা।'

আনন্দ হঠাৎ কথা খুঁজে পেল না। মুখ থেকে সে চুলগুলি পিছনে ঠেলে দিল। ডান হাতের ছোট-আঙ্গুলটির ডগা দাঁতে কামড়ে ধরে এক পায়ের আঙ্গুল দিয়ে অন্য পায়ের নখ থেকে ধূলো মুছে দিতে লাগল। তার মনে প্রবল আঘাত লেগেছে বুঝে হেরম্ব দুঃখ বোধ করল। কিন্তু এ আঘাত না দিয়ে তার উপায় ছিল না। আনন্দের কাছে সত্য গোপন করার ক্ষমতা তার নেই। তাছাড়া, প্রেম চিরকাল বাঁচে কোনদিন কোন অবস্থাতে কোন মানুষকেই এ শিক্ষা দিতে নেই।

হেরম্ব বিশ্বাস করে পৃথিবী থেকে যত তাড়াতাড়ি এ বিশ্বাস দূর হয়ে যায় ততই মঙ্গল।

আনন্দ হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'প্রেম মরে গেলে কি থাকে?'

'প্রেম ছাড়া আর সব থাকে। সুখে শান্তিতে ঘরকন্না করার জন্য যা যা দরকার। তাছাড়া খোকা অথবা খুকী থাকে—আরও একটা প্রেমের সম্ভাবনা। ওরা তুচ্ছ নয়।'

'কিন্তু প্রেম তো থাকে না। আসল জিনিষটাই তো মরে যায়! তারপর মানুষের সুখ সম্ভব কি করে?'

'সুখ হল শুঁট্‌কি মাছ—মানুষের জিভ হল, আসলে ছোটলোক। তাই কোন রকমে সুখের স্বাদ দিয়ে জীবনটা ভরে রাখা যায়। জীবন বড় নীরস আনন্দ—বড় নিরুৎসব। জীবনের গতি শ্লথ, মন্থর। ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে মানুষকে জীবন কাটাতে হয়। তার মধ্যে ওই প্রেমের উত্তেজনাটুকু তার উপরি লাভ।'

'সুখ হল—? শুঁট্‌কি মাছ! আগে যেন কার কাছে কথাটা শুনেছি।'

'তোমার মা খানিক আগে আমাকে বোঝাচ্ছিলেন।'

'হ্যাঁ, মা-ই বলছিল বটে। কিন্তু আপনি এমন সব কথা বলছেন যা শুনলে কান্না আসে।'

হেরম্ব একটি পা একধাপ নীচে নামিয়ে বলল, 'কান্না এলে চলবে না আনন্দ, হাসতে হবে। বুক কাঁপিয়ে যে দীর্ঘনিশ্বাস উঠবে তার সবটুকু বাতাস হাসি আর গানে পরিণত করে দিতে হবে। মানুষের যদি কোন ধর্ম্ম থাকে কোন তপস্যার প্রয়োজন থাকে, সে ধর্ম্ম এই, সে তপস্যা এই।

ানুষ কি করবে বল? পঞ্চাশ ষাট বছর তাকে বাঁচতে হবে অথচ জীবনে তার কাজ নেই।'

'কাজ নেই?'

'কোথায় কাজ? কি কাজ আছে মানুষের? অঙ্ক কষা, ইঞ্জিন ানানো, কবিতা লেখা? ওসব তো ভাণ, কাজের ছল! পৃথিবীতে কেউ ওসব চায় না। একদিন মানুষের জ্ঞান ছিল না, বিজ্ঞান ছিল না, সভ্যতা ছিল না, মানুষের কিছু এসে যায় নি। আজ মানুষের ওসব আছে কিন্তু তাতেও কারো কিছু এসে যায় না। কিন্তু মানুষ নিরুপায়। তার মধ্যে য বিপুল শূন্যতা আছে সেটা তাকে ভরতেই হবে। মানুষ তাই জটিল অঙ্ক দিয়ে, কায়দাদুরস্ত ভাল ভাল ভাব দিয়ে, ইস্পাতের টুকরা দিয়ে, আরও াব হাজার রকম জঞ্জাল দিয়ে সেই ফাঁকটা ভরতে চেষ্টা করে। পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে স্থাখো জীবন নিয়ে মানুষ কি হৈ-চৈ করছে, কি প্রবল প্রতিযোগিতা মানুষের, কি ব্যস্ততা। কাজ! কাজ! মানুষ কাজ করছে! বৌকে কাঁদিয়ে বৈজ্ঞানিক খুঁজছে নতুন ফরমূলা, আজও খুঁজছে কালও খুঁজছে। দোকান খুলে বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে চারিদিক ছেয়ে ফেলে, ঊর্দ্ধশ্বাসে ব্যবসায়ী করছে টাকা। ঘরের কোণে প্রদীপ জ্বেলে সে বিদ্রোহী কবি লিখছে কবিতা, সারাদিন ছবি এঁকে আর্টিষ্ট ওদিকে দ খেয়ে ফেণাচ্ছে জীবন। কেউ অলস নয় আনন্দ, কুলি, মজুর, াড়োয়ান, তারাও প্রাণপণে কাজ করছে। কিন্তু কেন করছে আনন্দ? াগলের মত মানুষ খালি কাজ করছে কেন? মানুষের কাজ নেই বলে! আসল কাজ নেই বলে! ছটফট করা ছাড়া আর কিছু করার নেই বলে!'

'কিন্তু আসল কাজটা কি? মানুষের যা নেই?'

'এ প্রশ্নেরও জবাব নেই আনন্দ। মানুষের কি নেই তাও মানুষের বুঝবার উপায় নেই। কাজ না পেয়ে মানুষ অকাজ করছে এটা বোঝা যায় কিন্তু তার কাজ কি হতে পারত তার কোন সংজ্ঞা নেই। এর কারণ কি জান? মানুষ যে স্তরের, তার জীবনের উদ্দেশ্য সেই স্তরে নেই। ঈশ্বরের মত, শেষ সত্যের মত, আমিত্বের মানের মত সেও মানুষের নাগালের বাইরে। জীবনের একটা অর্থ এবং পরিণতি অবশ্যই আছে, বিশ্ব-জগতে কিছুই অকারণ হতে পারে না। সৃষ্টিতে অজস্র নিয়মের সামঞ্জস্য দেখলেই সেটা বোঝা যায়। কিন্তু জীবনের শেষ পরিণতি জীবনে নেই। মানুষ চিরকাল তার সার্থকতা খুঁজবে, কিন্তু কখনো তার দেখা পাবে না। যোগী ঋষি হার মানলেন, দার্শনিক হার মানলেন, কবি হার মানলেন, অমার্জ্জিত আদিমধর্ম্মী মানুষও হার মানলে। চিরকাল এমনি হবে। কারণ, মানুষের সমগ্র সত্তাকে যা ছাড়িয়ে আছে, মানুষ তাকে আয়ত্ত করবে কি করে!'

কথা বলার উত্তেজনায় হেরম্বের সাময়িক বিস্মৃতি এসেছিল। শব্দের মোহ তার মন থেকে আনন্দের মোহকে কিছুক্ষণের জন্য স্থানচ্যুত করেছিল। জীবন সম্বন্ধে বক্তব্য শেষ করে পুনরায় আনন্দের সান্নিধ্যকে পূর্ণমাত্রায় অনুভব করে সে এই ভেবে বিস্মিত হয়ে রইল যে শ্রোতা ভিন্ন আনন্দ এতক্ষণ তার কাছে আর কিছুই ছিল না। আনন্দকে এতক্ষণ সে এমনি একটা সাধারণ পর্য্যায়ে ফেলে রেখেছিল যে শ্রবণশক্তি ছাড়া ওর আর কোন বিশেষত্বের সম্বন্ধেই সে সচেতন হয়ে থাকে নি। হেরম্ব বোঝে, বিচলিত হবার মত ত্রুটি অথবা অসঙ্গতি এটা নয়। কিন্তু ছেলে-

মানুষের মত তবু সে আনন্দের প্রতি তার এই তুচ্ছ অমনোযোগে আশ্চর্য্য হয়ে যায়।

হেরম্ব এটাও বুঝতে পারে, তার কাছে জীবনের ব্যাখ্যা শুনতে আনন্দ ইচ্ছুক নয়। জীবন কি, জীবনের উদ্দেশ্য আছে কি নেই, এসব তত্ত্বকথায় ওর বিরক্তি বোধ হচ্ছিল। অন্য সময় বিশ্লেষণ ওর ভাল লাগে কিনা হেরম্ব জানে না, কিন্তু আজ সন্ধ্যায় তার মুখের বিশ্লেষণ ওর কাছে শাস্তির মত লেগেছে। সে থেমে যেতে আনন্দ স্বস্তি লাভ করেছে। সে রোমিও জুলিয়েটের কথা বলুক, প্রেমের ব্যাখ্যা করুক, আনন্দ মন দিয়ে শুনবে। কিন্তু সেইখানেই তার ধৈর্য্যের সীমা। অনুভূতির সমন্বয় করা জীবনের সমগ্রতাকে সে জানতে চায় না, বুঝতে চায় না, ভাবতে চায় না।

তাই হোক। তাই ভাল। হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল, 'চন্দ্রকলা নাচটা কি আনন্দ?'

আনন্দ বলল, 'ধরুন, আমি যেন মরে গেছি। অমাবস্যার চাঁদের মত আমি যেন নেই। প্রতিপদে আমার মধ্যে একটুখানি জীবনের সঞ্চার হল। ভাল করে বোঝা যায় না এমনি একফোঁটা একটু জীবন। তারপর চাঁদ যেমন কলায় কলায় একটু একটু করে বাড়ে আমার জীবনও তেমনি করে বাড়ছে। বাড়তে বাড়তে যখন পূর্ণিমা এল, আমি পূর্ণমাত্রায় বেঁচে উঠেছি। তারপর একটু একটু করে মরে—'

'এ নাচ ভাল নয়, আনন্দ।'

'কেন?'

'একটু একটু করে মরার নাচ নেচে তোমার যদি সত্যি সত্যি মরতে ইচ্ছা হয়?'

আনন্দ একটু হাসল। 'মরতে ইচ্ছা হবে কেন? ঘুম পায়। এক মিনিটও তারপর আমি আর দাঁড়াতে পারি না। কোন রকমে বিছানায় গিয়ে দড়াম করে আছড়ে পড়েই নাক ডাকাতে আরম্ভ করে দি। মা বলে—'

'কি বলে?'

'আপনাকে বলতে লজ্জা হচ্ছে।'

'চোখ বুজে আমি এখানে নেই মনে করে বল।'

'না দূর! সে বলা যায় না।'

হেরম্ব মৃদু হেসে বলল, 'প্রথম তোমাকে দেখে মনে হয় নি তুমি এত ভীরু। এটা তোমার ভয় না লজ্জা আনন্দ?'

আনন্দ বলল, 'মানুষকে আমি ভয় করি নে।'

'তবে তুমি ছেলেমানুষ—লাজুক।'

'ছেলেমানুষ? আমায় একথা বললে অপমান করা হয় তা জানেন?' আনন্দ হঠাৎ হেসে উঠে হাত বাড়িয়ে হেরম্বের হাঁটুতে টোকা দিয়ে বলল, 'আমার অনেক বয়েস হয়েছে। আমাকে সম্ভ্রম করে কথা কইবেন।' হেরম্ব জানে, এসব ভূমিকা। তার নাচ সম্বন্ধে মালতী কি বলেছে আনন্দ তা শোনাতে চায়, কিন্তু পেরে উঠছে না। হেরম্ব মৃদু হেসে অবজ্ঞার সুরে বলল, 'ছেলেমানুষকে আবার সম্ভ্রম করব কি?'

'ছেলেমানুষ হলাম কিসে?'

'ছেলেমানুষরাই একটা কথা বলতে দশবার লজ্জা পায়।'

আনন্দ উদ্ধত সাহসের সঙ্গে বলল, 'লজ্জা পাচ্ছে কে? আমি?

জগতে এমন কথা নেই আমি যা বলতে লজ্জা পাই। নাচার পর আমার ঘুম দেখে মা বলে, তোর আর বিয়ের দরকার নেই আনন্দ।'

বলে আনন্দ হঠাৎ উদ্ধত ভাবে হেরম্বকে আক্রমণ করল, বলল, 'আপনি নেহাৎ অভদ্র। মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে জানেন না।'

মনে হয় সে বুঝি হঠাৎ উঠে চলে যাবে। হেরম্বের মুখের দিকে তাকিয়ে ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে সে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। ঠোঁট দুটি কাঁপতে থাকে।

নিষ্ঠুর আনন্দের সঙ্গে হেরম্ব লজ্জাতুর অপ্রতিভ আনন্দের আত্ম-সম্বরণের ব্যাকুল প্রয়াসকে উৎসাহিত করে বলে, 'বলো বলো, থেম না আনন্দ।'

'না, বলব না। কেন বলব!'

হেরম্ব আরও নির্ম্মম হয়ে বলে, 'তুমি তাহলে বুড়ী নও আনন্দ? মিছামিছি তোমার তাহলে রাগ হয়? এতক্ষণ আমাকে তুমি ঠকাচ্ছিলে?'

'আপনি চলে যান। আপনাকে আমি নাচ দেখাব না।'

'দেখিও না। আমি ঢের নাচ দেখেচি।'

'তাহলে অনর্থক বসে আছেন কেন? রাত হল, বাড়ী যান না।'

'বেশ। তোমার মাকে ডাকো। বলে যাই।'

আনন্দ চুপ করে বসে রইল। হেরম্ব বুঝতে পারে, সে কি ভাবছে। সে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। হেরম্ব নিষ্ঠুরতা করেছে বলে নয়, নিজেকে সে সত্য সত্যই সম্পূর্ণ অকারণে ছেলেমানুষ করে ফেলেছে বলে। এ ব্যাপার আনন্দ বুঝতে পারছে না। নৃত্য করে' সে মেয়েদের বিবাহিত জীবনের আনন্দ ও অবসাদ পায় এই কথাটি সে এত বেশী লজ্জাকর মনে করে না

সে হেরম্বকে শোনানো যায় না। হেরম্বকে অবাধে একথা বলতে পারার বয়স তার হয়েছে বলেই আনন্দ মনে করে। তাই অসঙ্গত লজ্জার বশে বিচলিত হয়ে ব্যাপারটাকে এ ভাবে তাল পাকিয়ে দেওয়ার জন্য নিজের উপরে সে রেগে উঠেছে। লজ্জা পেয়েও চুপ করে থাকলে অথবা পাকা মেয়ের মত হাসি-তামাসার একটা অভিনয় বজায় রাখতে পারলে হেরম্বের কাছ থেকে লজ্জাটা লুকানো যেত ভেবে তার আপশোষের সীমা নেই। আঠার বছর বয়সে হেরম্বের কাছে আটাশ বছরের ধীর সপ্রতিভ ও পূর্ণ পরিণত নারী হতে চেয়ে একেবারে তেরো বছরের মেয়ে হয়ে বসার জন্য নিজেকে আনন্দ কোন মতেই ক্ষমা করতে পারছে না।

আনন্দের অস্বস্তিতে হেরম্ব কিন্তু খুসী হল। আনন্দ রাগ করতে পারে এই ভয়কে জয় করে তার প্রতি নিষ্ঠুর হতে পেরে নিজের কাছেই সে কৃতজ্ঞতা বোধ করেছে। যার সান্নিধ্যই আত্মবিস্মৃতির প্রবল প্রেরণা, তাকে শাসন করা কি সহজ মনের জোরের পরিচয়! হেরম্বের মনে হঠাৎ যেন শক্তি ও তেজের আবির্ভাব ঘটল।

কিন্তু সেই সঙ্গে এই জ্ঞানকেও তার আমল দিতে হল যে আনন্দকে সে আগাগোড়া ভয় করে এসেছে। আনন্দ ইচ্ছা করলেই তার ভয়ানক ক্ষতি করতে পারে, কোন এক সময়ে এই আশঙ্কা তার মনে এসেছিল এবং এখনো তা স্থায়ী হয়ে আছে। নিজের এই ভীরুতার জন্ম-ইতিহাস ক্রমে ক্রমে তার কাছে পরিস্ফুট হয়ে যায়।

সে বুঝতে পারে অনেক দিক থেকে নিজেকে সে আনন্দের কাছে সমর্পণ করে দিয়েছে। অনেক বিষয়েই সে আনন্দের কাছে পরাধীন। দুঃখ না পাবার অনেকখানি স্বাধীনতাই সে স্বেচ্ছায় আনন্দের হাতে তুলে

দিয়েছে। তার জীবনে ওর কর্তৃত্ব এখন সামান্য নয়, তার হৃদয়মনের নিয়ন্ত্রণে ওর প্রচুর যথেচ্ছাচার সম্ভব হয়ে গিয়েছে।

যতক্ষণ পারে দেরী করে মালতীকে এবার আসতে হল।

— 'তোমাদের দুটিতে দেখছি দিব্যি ভাব হয়ে গেছে।'

আনন্দ বলল, 'আমরা বন্ধু, মা।'

'বন্ধু!' মালতীর স্বরে অসন্তোষ প্রকাশ পেল। 'বন্ধু কি লো ছুঁড়ি। হেরম্ব যে তোর গুরুজন, শ্রদ্ধার পাত্র।'

'বন্ধু বুঝি অশ্রদ্ধার পাত্র মা?'

মালতী মাটির প্রদীপ জ্বেলে এনেছিল। মন্দিরের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে সে আরও একটি বৃহৎ প্রদীপ জ্বেলে দিল। হেরম্ব উঠে এসে দরজার কাছে দাঁড়াল। মন্দির প্রশস্ত, মেঝে লাল সিমেণ্ট করা। দেবতা শিশুগোপাল। ছোট একটি বেদীর উপর বাৎসল্য আকর্ষণের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন। মালতী দুটি নৈবেদ্য সাজাচ্ছিল। হেরম্ব দেবতাকে দেখছে, মুখ না ফিরিয়েই এটা সে কি করে টের পেল বলা যায় না।

'কি রকম ঠাকুর, হেরম্ব?'

'বেশ, মালতী-বৌদি।'

আনন্দ ওঠে নি। সেইখানে তেমনিভাবে বসেছিল। হেরম্ব ফিরে গিয়ে তার কাছে বসল।

'তুমি দেবদাসী নাকি আনন্দ?'

'আজ্ঞে না, আমি কারো দাসী নই।'

'তবে মন্দিরে ঠাকুরের সামনে নাচো যে?'

'ঠাকুরের সামনে বলে নয়। মন্দিরে জায়গা অনেক, মেঝেটাও বেশ মসৃণ। সবদিন মন্দিরে নাচি না। মাঝে মাঝে। আজ এইখানে নাচব, এই ঘাসের জমিটাতে। ঠাকুর আমাদের সৃষ্টি করেছেন, ভক্তের কাছে যা প্রণামী পান তাই দিয়ে ভরণপোষণ করেন। এটা হল তাঁর কর্ত্তব্য। কর্ত্তব্য করবার জন্য সামনে নাচব, নাচ আমার অত সস্তা নয়।'

'বোঝা যাচ্ছে দেবতাকে তুমি ভক্তি কর না।'

'ভক্তি করা উচিত নয়। বাবা বলেন, বেশী ভক্তি করলে দেবতা চটে যান। দেবতা কি বলেন, শুনবেন? বলেন, ওরে হতভাগার দল! আমাকে নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তোরা একটু আত্মচিন্তা করতো বাপু! আমাকে নিয়ে পাগল হয়ে থাকবার জন্য তোদের আমি পৃথিবীতে পাঠাই নি। সবাই মিলে তোরা আমাকে এমন লজ্জা দিস্!'

হেরম্ব খুসী হয়ে বলল, 'তুমি তো বেশ বলতে পার আনন্দ?'

'আমি বলতে পারি ছাই। এসব বাবার কথা।'

'তোমার বাবা বুঝি খুব আত্মচিন্তা করেন?'

'দিনরাত। বাবার আত্মচিন্তার কামাই নেই। আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় আজ বোধ হয় মন একটু বিচলিত হয়েছিল, এসেই আসনে বসেছেন। কখন উঠবেন তার ঠিক নেই। এক একদিন সারারাত আসনে বসেই কাটিয়ে দেন।'

মন্দিরের মধ্যে মালতী শুনতে পাবে বলে আনন্দ হেরম্বের দিকে ঝুঁকে পড়ল।

'এই জন্ম মা এত ঝগড়া করে। বলে বাড়ী বসে ধ্যান করা কেন, বনে গেলেই হয়! বাবা সত্যি সত্যি দিনের পর দিন যেন কি রকম হয়ে যাচ্ছেন। এত কম কথা বলেন যে মনে হয় বোবাই বুঝি হবেন।'

হেরম্ব একথা জানে। অনাথ চিরদিন স্বল্পভাষী। সেরকম স্বল্পভাষী নয়, বেশী কথা কইলে দুর্ব্বলতা ধরা পড়ে যাবে বলে যারা চুপ করে থাকে। নিজেকে প্রকাশ করতে অনাথের ভাল লাগে না। তার কম কথা বলার কারণ তাই।

মন্দিরের মধ্যে পঞ্চ-প্রদীপ নেড়ে টুং টাং ঘণ্টা বাজিয়ে মালতী এদিকে আরতি আরম্ভ করে দিয়েছিল। হেরম্ব বলল, 'প্রণামী দেবার ভক্ত কই আনন্দ?'

'তারা সকালে আসে। দু'মাইল হেঁটে রাত করে কে এতদূরে আসবে! বিকালে আমাদের একটি পয়সা রোজগার নেই। আজ আপনি আছেন আপনি যদি কিছু দেন।'

'তুমি আমার কাছে টাকা আদায়ের চেষ্টা করছ?'

'আমি আদায় করব কেন? পুণ্য অর্জ্জনের জন্ম আপনি নিজেই দেবেন। আমি শুধু আপনাকে উপায়টা বাৎলে দিলাম।' আনন্দ হাসল। মালতীর ঘণ্টা এই সময় নীরব হওয়ায় আবার হেরম্বের দিকে ঝুঁকে বলল, 'তাই বলে মা প্রণাম করতে ডাকলে প্রণামী দিয়ে বসবেন না যেন সত্যি সত্যি! মা তাহলে ভয়ানক রেগে যাবে।'

'মাকে তুমি খুব ভয় কর নাকি আনন্দ?'

'না, মাকে ভয় করি না। মা'র রাগকে ভয় করি।'

হেরম্ব এক টিপ নস্য নিল। সহজ আলাপের মধ্যে তার আত্মগ্লানি কমে গেছে।

'আমাকে ? আমাকে তুমি ভয় কর না আনন্দ ?'

'আপনাকে ? আপনাকে আমি চিনি না, আপনার রাগ কি রকম জানি না। কাজেই বলতে পারলাম না।'

'আমাকে তুমি চেনো না আনন্দ ! আমি তোমার বন্ধু যে !'

আনন্দ অতি মাত্রায় বিস্মিতা হয়ে বলল, 'বাস্! শোন কথা! আপনি আবার বন্ধু হলেন কখন ?'

'একটু আগে তুমি নিজেই বলেছ। মালতী-বৌদি সাক্ষী আছে।'

আনন্দ সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'ভুল করে বলেছিলাম। আমি ছেলেমানুষ, আমার কথা ধরবেন না। কখন কি বলি-না-বলি ঠিক আছে কিছু !'

'এরকম অবস্থায় তোমার তবে কিছু না বলাই ভাল, আনন্দ।'

'কিছু বলছিও না আমি। কি বলেছি ? চুপ করে বসে আছি। আপনার যদি মনে হয়ে থাকে আমি বেশী কথা বলছি, আপনার ভুল মনে হয়েছে জানবেন।···ওই দেখুন, চাঁদ উঠেছে।'

আনন্দ মুখ তুলে চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে। আর হেরম্ব তাকায় তার মুখের দিকে। তার অবাধ্য বিশ্লেষণ-প্রিয় মন সঙ্গে সঙ্গে বুঝবার চেষ্টা করে তেজী আলোর চেয়ে জ্যোৎস্নার মত মৃদু আলোতে মানুষের মুখ আরও বেশী সুন্দর হয়ে ওঠে কেন। আলো অথবা মানুষের চোখ, কোথায় এ ভ্রান্তির সৃষ্টি হয় ?

হেরম্বের ধারণা ছিল কাব্যকে, বিশেষ করে চাঁদের আলোর কাব্যকে সে বহুকাল পূর্ব্বেই কাটিয়ে উঠেছে। জ্যোৎস্নার একটি মাত্র গুণের

মর্য্যাদাই তার কাছে আছে, যে এ আলো নিষ্প্রভ, এ আলোতে চোখ জ্বলে না। অথচ, আজ শুধু আনন্দের মুখে এসে পড়েছে বলেই তার মত সিনিকের কাছেও চাঁদের আলো জগতের আর সব আলোর মধ্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠল।

হেরম্বের বিশ্লেষণ-প্রবৃত্তি হঠাৎ একটা অভূতপূর্ব্ব সত্য আবিষ্কার করে তাকে নিদারুণ আঘাত করে। কবির খাতা ছাড়া পৃথিবীর কোথায়ও যে কবিতা নেই, কবির জীবনে পর্য্যন্ত নয়, তার এই জ্ঞান পুরানো। কিন্তু এই জ্ঞান আজও যে তার অভ্যাস হয়ে যায় নি, আজ হঠাৎ সেটা বোঝা গেছে। কাব্যকে অসুস্থ নার্ভের টঙ্কার বলে জেনেও আজ পর্য্যন্ত তার হৃদয়ের কাব্যপিপাসা অব্যাহত রয়ে গেছে, প্রকৃতির সঙ্গে তার কল্পনার যোগসূত্রটি আজও ছিঁড়ে যায় নি। রোমান্সে আজও তার অন্ধ বিশ্বাস, আকুল উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ আজও তার কাছে হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ পরিচয়, জ্যোৎস্না তার চোখের প্রিয়তম আলো। হৃদয়ের অন্ধ সত্য এতকাল তার মস্তিষ্কের নিশ্চিত সত্যের সঙ্গে লড়াই করেছে। তার ফলে, জীবনে কোন দিকে তার সামঞ্জস্য থাকে নি, একধার থেকে সে কেবল করে এসেছে ভুল। দুটি বিরুদ্ধ সত্যের একটিকে সজ্ঞানে আর একটিকে অজ্ঞাতসারে একসঙ্গে মর্য্যাদা দিয়ে এসে জীবনটা তার ভরে উঠেছে শুধু মিথ্যাতে। তার প্রকৃতির যে রহস্য, যে দুর্ব্বোধ্যতা সম্মোহন-শক্তির মত মেয়েদের আকর্ষণ করেছে, সে তবে এই? রূঢ় বেদনা ও লজ্জার সঙ্গে হেরম্ব নিজেকে এই প্রশ্ন করে।

মিথ্যার প্রকাণ্ড একটা স্তূপ ছাড়া সে আর কিছুই নয়, নিজের কাছে এই জবাব সে পায়।

আনন্দের মুখ তার চোখের সামনে থেকে মুছে যায়। আত্মোপলব্ধির প্রথম প্রবল আঘাতে তার দেখবার অথবা শুনবার ক্ষমতা অসাড় হয়ে থাকে। এ সহজ কথা নয়। অন্তরের একটা পুরানো শবগন্ধী পচা অন্ধকার আলোয় ভেসে গেল, একটা নিরবিচ্ছিন্ন দুঃস্বপ্নের রাত্রি দিন হয়ে উঠল। এবং তা অতি অকস্মাৎ। এরকম সাংঘাতিক মুহূর্ত্ত হেরম্বের জীবনে আর আসে নি। এতগুলি বছর ধরে তার মধ্যে দু'জন হেরম্ব গাঢ় অন্ধকারে যুদ্ধ করেছে, আজ আনন্দের মুখে-লাগা চাঁদের আলোয় তারা দৃশ্যমান হয়ে ওঠায় দেখা গেছে, শত্রুতা করে পরস্পরকে দু'জনেই তারা ব্যর্থ করে দিয়েছে। হেরম্বের পরিচয়, ওদের লড়াই। আর কিছু নয়। ফুলের বেঁচে থাকার চেষ্টার সঙ্গে কীটের ধ্বংসপিপাসার দ্বন্দ্ব, এই রূপকটাই ছিল এতকালের হেরম্ব।

সমারোহের সঙ্গে দিনের পর দিন নিজের এই অস্তিত্বহীন অস্তিত্বকে সে বয়ে বেড়িয়েছে। চকমকির মত নিজের সঙ্গে নিজেকে ঠুকে চারিদিকে ছড়িয়ে বেড়িয়েছে আগুন! কড়িকাঠের সঙ্গে দড়ি বেঁধে গলায় ফাঁস লাগিয়ে সেই উমাকে ঝুলিয়ে দিয়েছিল। সে খুনী।

হেরম্ব নিঝুম হয়ে বসে থাকে। জীবনের এই প্রথম ও শেষ প্রকৃত আত্মচেতনাকে বুঝেও আরও ভাল করে বুঝবার চেষ্টায় জাল-টানা পচা পুকুরের উত্থিত বুদ্‌বুদের মত অসংখ্য প্রশ্ন, অন্তহীন স্মৃতি তার মনে ভেসে ওঠে।

আনন্দ দু'বার তার প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করলে তবে সে তার কথা শুনতে পায়।

'কি ভাবছি? ভাবছি এক মজার কথা আনন্দ।'

'কি মজার কথা ?'

'আমি অন্যায় করে এতদিন যত লোককে কষ্ট দিয়েছি, তুমি আমাকে তার উপযুক্ত শাস্তি দিলে।'

এই হেঁয়ালীটি নিয়ে আনন্দ পরিহাস করল না।

'বুঝতে পারলাম না যে ? বুঝিয়ে বলুন।'

'তুমি বুঝবে না আনন্দ।'

'বুঝব। আমি কি করেছি, আমি তা বুঝব। যত বোকা ভাবেন, আমি তত বোকা নই।'

হেরম্ব বিষণ্ণ হাসি হেসে বলল, 'তোমার বুদ্ধির দোষ দিই নি। কথাটা বুঝিয়ে বলার মত নয়। আমার এমন খারাপ লাগছে আনন্দ।'

আনন্দ সামনের দিকে তাকিয়ে নিরানন্দ স্বরে বলল, 'তার মানে আমার জন্য খারাপ লাগছে ? আচ্ছা লোক যাহোক আপনি !'

হেরম্ব অনুযোগ দিয়ে বলল, 'আমার মন কত খারাপ হয়ে গেছে জানলে তুমি রাগ করতে না আনন্দ।'

আনন্দ বলল, 'মন বুঝি খালি আপনারই খারাপ হতে জানে ? সংসারে আর কারো বুঝি মন নেই ? হেঁয়ালী করা সহজ ! কারণ তাতে বিবেচনা থাকে না। লোকের মনে কষ্ট দেওয়া পাপ। এমনিতেই মানুষের মনে কত দুঃখ থাকে।'

আনন্দের অভিমানে হেরম্বের হাসি এল।

'তোমার দুঃখ কিসের আনন্দ !'

'আপনারই বা মন খারাপ হওয়া কিসের ? চাঁদ উঠেছে, এমন হাওয়া দিচ্ছে, এখুনি প্রসাদ খেতে পাবেন, তার পর আমার নাচ

দেখবার আশা করে থাকবেন,—আপনারই তো বোলো আনা সুখ। দুঃখ হতে পারে আমার। আমি এত মন্দ যে লোককে মিছিমিছি কখন শাস্তি দি' নিজে তা টেরও পাই না। আমার কাছে বসতে হলে লোকের এমনি বিশ্রী লাগে, আমি মিষ্টি মিষ্টি কথা বললেও। হুঁঃ, আমার দুঃখের নাকি তুলনা আছে।'

হেরম্ব ভাবল, আজ নিজের কথা ভেবে লাভ নেই। নিজের কথা ভুল করে ভেবে এতদিন জীবনটা অপচয়িত হয়ে গেছে, এখন নির্ভুল করে ভাবতে গেলেও আজ রাত্রিটা তাই যাবে। আনন্দের অমৃতকে আত্মবিশ্লেষণের বিষে নষ্ট করে আগামী কালের অনুশোচনা বাড়ানো সঙ্গত হবে না।

'খারাপ লাগছে কেন, জান ?'

'কি করে জানব ? বলেছেন ?' আনন্দ আশান্বিত হয়ে উঠল।

'তোমার কাছে বসে আছি বলে যে খারাপ লাগছে একথা মিথ্যে নয় আনন্দ।'

'তা জানি।'

'কিন্তু কেন জান ?'

আনন্দ রেগে বলল, 'জানি জানি। আমার সব জানা আছে। কেবল জান জান করে একটা কথাই একশোবার শোনাবেন তো !'

'একটা কথা একশোবার আমি কারুকে শোনাই না। এমন কথা শোনাব, কখনো তুমি যা শোন নি।'

'থাক। না শুনলেও আমার চলবে। আপনি অনেক কথা বলেছেন, ফুস্‌ফুস্‌ হয়তো আপনার ব্যথা হয়ে গেছে। এইবার একটু চুপ করে বসুন।'

'আর তা হয় না আনন্দ। তোমাকে শুনতেই হবে। তোমার কাছে বসে আমার মনে হচ্ছে, এতকাল তোমার সঙ্গে কেন আমার পরিচয় ছিল না? তাই খারাপ লাগছে।'

আনন্দের নালিশ করবার পর থেকে বিনা পরামর্শেই তাদের গলা নীচু হয়ে গিয়েছিল। নিজের কথা নিজের কানেই যেন শোনা চলবে না।

হেরম্ব নয়, সেই যেন মিথ্যা কথা বলেছে এমনি ভাবে আনন্দ বলল, 'আপনি এমন বানিয়ে বলতে পারেন!'

আরতি শেষ করে আনন্দ আজ মন্দিরে নাচবে না শুনে মালতী মন্দিরের দরজায় তালা দিল।

'এসে থেকে ঠায় বসে আছ সিঁড়িতে। ঘরে চলো হেরম্ব। তুই এই বেলা কিছু খেয়ে নেনা আনন্দ?'

বাড়ীর দিকে চলতে আরম্ভ করে আনন্দ বলল, 'প্রসাদ খেলাম যে?'

'প্রসাদ আবার খাওয়া কিলো ছুঁড়ি? আর কিছু খা। নাচবেন বলে মেয়ে আমার খাবেন না, ভারি নাচনেউলি হয়েছেন।'

আনন্দ তাকে ভয় দেখিয়ে বলল, 'শোন মা, শোন। আজ যদি আমায় বক, সেদিনের মত হবে কিন্তু।'

হেরম্ব দেখে বিস্মিত হল যে একথায় মালতী সত্য সত্যই ভড়কে গেল।

'কে তোকে বকছে বাবু! শুধু বলেছি, কিছু খা। খেতে বলাও দোষ!'

হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল, 'সেদিন কি হয়েছিল ?'

আনন্দ বলল, 'বোলো না মা।'

মালতী বলল, 'আমি একটু বকেছিলাম। বলেছিলাম, উপোস করে থাকলে নাচতে পাবি না আনন্দ। এই শুধু বলেছি, আর কিছুই নয়। যেই বলা—'

আনন্দ বলল, 'যেই বলা! কতক্ষণ ধরে বকেছিলে মনে নেই বুঝি ?'

মালতী বলল, 'হ্যাঁরে, হ্যাঁ, তোকে আমি সারাদিন ধরে শুধু বকছি। খেয়ে-দেয়ে আমার আর কাজ নেই। তারপর মেয়ে আমার কি করল জান হেরম্ব ? কান্না আরম্ভ করে দিল। সে কি কান্না হেরম্ব, বাপের জন্মে আমি অমন কান্না দেখি নি। কিছুতেই কি থামে ? লুটিয়ে লুটিয়ে মেয়ে আমার কাঁদছে তো কাঁদছেই। আমরা শেষে ভয় পেয়ে গেলাম। আমি আদর করি, উনি এসে কত বোঝান, মেয়ের কান্না তবু থামে না। দু'জনে আমরা হিমসিম খেয়ে গেলাম।'

হেরম্ব ফিস্ ফিস্ করে মালতীকে জিজ্ঞাসা করল, 'আনন্দ পাগল নয় তো, মালতী-বৌদি ?'

'কি জানি। ওকেই জিজ্ঞেস কর।'

আনন্দ কিছুমাত্র লজ্জা পেয়েছে বলে মনে হ'ল না। সপ্রতিভ ভাবেই সে বলল, 'পাগল বৈকি! আমি অভিনয় করেছিলাম, মজা দেখেছিলাম।'

'চোখ দিয়ে জলও তুই অভিনয় করেই ফেলেছিলি, না রে আনন্দ ?'

'চোখ দিয়ে জল ফেলা কিছু শক্ত নাকি! বল না, এখুনি মেঝেতে পুকুর করে দিচ্ছি! বসুন ওই চৌকিটাতে।'

হেরম্ব বসল। দু'টি ঘরের মাঝখানে সরু ফাঁক দিয়ে বাড়ীতে ঢুকে অন্দরের বারান্দা হয়ে সে এই ঘরে পৌঁছেছে। বারান্দায় বোঝা গিয়েছিল, বাড়ীটা লম্বাটে ও দুপেশে। লম্বা সারিতে বোধ হয় ঘর তিনখানা, অন্যপাশে একখানি মাত্র ঘর এবং তার সঙ্গে লাগানো নীচু একটা চালা। চালার নীচে দু'টি আবছা গরু হেরম্বের চোখে পড়েছিল। বাড়ীর আর দু'টি দিক প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। প্রাচীরের মাথা ডিঙ্গিয়ে জ্যোস্নালোকে বনানীর মত নিবিড় একটি বাগান দেখা যায়।

এ ঘরখানা লম্বা সারির শেষে।

হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল, 'এটা কার ঘর?'

আনন্দ বলল, 'আমার।'

চৌকীর বিছানা তবে আনন্দের? প্রতি রাত্রে আনন্দের অঙ্গের উত্তাপ এই শয্যায় সঞ্চিত হয়? বালিশে আনন্দের গালের স্পর্শ লাগে? হেরম্ব নিজেকে অত্যন্ত শ্রান্ত মনে করতে লাগল। জুতো খুলে বলল, 'আমি একটু শুলাম আনন্দ।'

'শুলেন? শুলেন কি রকম!' তার শয্যায় হেরম্ব শোবে শুনে আনন্দের বোধ হয় লজ্জা করে উঠল।

মালতী বলল, 'শোও না, শোও। একটা উঁচু বালিশ এনে দে আনন্দ। আমার ঘর থেকে তোর বাপের তাকিয়াটা এনে দে বরং। যে বালিশ তোর।'

হেরম্ব প্রতিবাদ করে বলল, 'বালিশ চাই না মালতী-বৌদি। উঁচু বালিশে আমার ঘাড় ব্যথা হয়ে যায়।'

মালতী হেসে বলল, 'কি জানি বাবু, কি রকম ঘাড় তোমার।

আমি তো উঁচু বালিশ নইলে মাথায় দিতে পারি না। আচ্ছা তোমরা গল্প কর, আমি আমার কাজ করি গিয়ে। ওকে খেতে দিস্ আনন্দ।'

আনন্দ গম্ভীর হয়ে বলল, 'কি কাজ করবে মা?'

'সাধনে বসব।'

'আজও তুমি ওই সব খাবে? একদিন না খেলে চলে না তোমার?'

মালতীর মধ্যেও হেরম্ব বোধ হয় সাময়িক কিছু পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। রাগ না করে সে শান্ত ভাবেই বলল, 'কেন, আজ কী? হেরম্ব এসেছে বলে? আমি পাপ করি না আনন্দ যে ওর কাছ থেকে লুকোতে হবে। হেরম্বও খাবে একটু।'

আনন্দ বলল, 'হ্যাঁ, খাবে বৈকি! অতিথিকে আর দলে টেনো না মা।'

মালতী বলল, 'তুই ছেলেমানুষ, কিছু বুঝিসনে, কেন কথা কইতে আসিস আনন্দ? হেরম্ব খাবে বৈকি। তোমাকে একটু কারণ এনে দি হেরম্ব?' বলে সে ব্যগ্র দৃষ্টিতে হেরম্বের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

হেরম্বের অনুমানশক্তি আজ আনন্দসংক্রান্ত কর্ত্তব্যগুলি সম্পন্ন করতেই অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়েছিল। তবু নিজে কারণ পান করে একটা অস্বাভাবিক মানসিক অবস্থা অর্জ্জন করার আগেই তাকে মদ খাওয়াবার জন্য মালতীর আগ্রহ দেখে সে একটু বিস্মিত ও সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। ভাবল, মালতী-বৌদি আমাকে পরীক্ষা করছে নাকি? আমি মদ খাই কিনা, নেশায় আমার আসক্তি কতখানি তাই যাচাই করে দেখছে?

মালতীর অস্বাভাবিক সারল্য এবং ভবিষ্যতে আসা-যাওয়া বজায়

রাখার জন্য তাকে অল্প সময়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতায় বেঁধে ফেলার প্রাণপণ প্রয়াস স্মরণ করে হেরম্বের মনে হ'ল, মালতী যে সন্ধ্যা থেকে তার দুর্ব্বলতার সন্ধান করছে—একথা হয়ত মিথ্যা নয়। মালতীর মনের ইচ্ছাটা মোটামুটি অনুমান হেরম্ব অনেক আগেই করেছিল। যে গৃহ একদিন সে স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে এসেছে, মেয়ের জন্য তেমনি একটি গৃহ সৃষ্টি করতে চেয়ে মালতী ছট্‌ফট্‌ করছে। তারা চিরকাল বাঁচবে না, আনন্দের একটা ব্যবস্থা হওয়া দরকার। কিন্তু গৃহ যাদের একচেটিয়া তারা যে কতদূর নিয়মকানুনের অধীন সে খবর মালতী রাখে। কুড়ি বছরের পুরাতন গৃহত্যাগের ব্যাপারটা লুকিয়ে, অনাথ যে তার বিবাহিত স্বামী নয় এ খবর গোপন করে, মেয়ের বিয়ে দেবার সাহস মালতীর নেই। অথচ আনন্দ যে পুরুষের ভালবাসা পাবে না, ছেলে-মেয়ে পাবে না, মেয়েমানুষ হয়ে একথাটাও সে ভাবতে পারে না। আজ সে এসে দাঁড়ানোমাত্র মালতীর আশা হয়েছে। বারো বছর আগে মধুপুরে তার যে পরিচয় মালতী পেয়েছিল হয়ত সে তা ভোলে নি।

কিন্তু তবু সে যাচাই করে নিতে চায়। বুঝতে চায়, অনাথের শিষ্য কতখানি অনাথের মত হয়েছে।

হেরম্ব বলল, 'না, কারণ-টারণ আমার সইবে না মালতী-বৌদি।'

'খাও নি বুঝি কখনো?'

কখনো খায় নি বললে মালতী বিশ্বাস করবে না মনে করে হেরম্ব বলল, 'একদিন খেয়েছিলাম। আমার এক ব্যারিষ্টার বন্ধুর বাড়ীতে। একদিনেই সখ মিটে গেছে, মালতী-বৌদি।'

সুপ্রিয়ার কথা হেরম্বের মনে পড়ছিল। একদিন একটুখানি মদ

খেয়েছিল বলে তাকে সে ক্ষমা করে নি। আজ মিথ্যা বলে মালতীর কাছে তাকে আত্মসমর্থন করতে হচ্ছে।

মালতী খুসী হয়ে বলল, 'তাহলে তোমার না খাওয়াই ভাল। সাধনের জন্য বাধ্য হয়ে আমাকে খেতে হয়, তাছাড়া ওতে আমার কোন ক্ষতিই হয় না হেরম্ব। কারণ-পান করলে তোমার নেশা হবে, আমার শুধু একাগ্রতার সাহায্য হয়। প্রক্রিয়া আছে, মন্ত্রতন্ত্র আছে,—সে সব তুমি বুঝবে না হেরম্ব। বাবা বলেন, নেশার জন্য ওসব খাওয়া মহাপাপ। আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য খাও, কোন দোষ নেই।'

আনন্দ মিনতি করে বলল, 'আজ থাক মা।'

মালতী মাথা নেড়ে অস্বীকার করে চলে গেল।

ঘরের মাঝখানে লণ্ঠন জ্বলছিল। কাঁচ পরিষ্কার, পলতে ভাল করে কাটা, আলো বেশ উজ্জ্বল। পূর্ণিমার প্রাথমিক জ্যোৎস্নার চেয়ে ঢের বেশী উজ্জ্বল। হেরম্বের মনে হল, আনন্দের মুখ ম্লান দেখাচ্ছে।

আনন্দ বলল, 'মা'র দোষ নেই।'

'দোষ ধরি নি, আনন্দ।'

'দোষ না ধরলে কি হবে। মেয়েমানুষ মদ খায় একি সহজ দোষের কথা।'

সুপ্রিয়াকে মনে করে হেরম্ব চুপ করে রইল।

একটা জলচৌকী সামনে টেনে এনে আনন্দ তাতে বসল।

'কিন্তু মা'র সত্যি দোষ নেই। এসব বাবার জন্যে হয়েছে। জানেন,

মা'র মনে একটা ভয়ানক কষ্ট আছে। একবার পাগল হয়ে যেতে বসেছিল এই কষ্টের জন্যে।'

'কিসের কষ্ট ?

আনন্দ বিষণ্ণ চিন্তিত মুখে গোলাকার আলোর শিখাটির দিকে তাকিয়ে ছিল। চোখ না ফিরিয়েই বলল, 'মা বাবাকে ভয়ানক ভালবাসে। বাবা যদি দু'দিনের জন্যও কোথাও চলে যান, মা ভেবে ভেবে ঠিক পাগলের মত হয়ে থাকে। বাবা কিন্তু মাকে দু'চোখে দেখতে পারেন না। আমার জ্ঞান হবার পর থেকে একদিন বাবাকে একটি মিষ্টি কথা বলতে শুনি নি।' হেরম্ব অবাক হয়ে বলল, 'কিন্তু মাষ্টারমশায় তো কড়া কথা বলবার লোক নন।'

'রেগে চেঁচামেচি করে না বললে বুঝি কড়া কথা বলা হয় না? আপনার সামনে মাকে আজ কিরকম অপদস্থ করলেন দেখলেন না? চব্বিশ ঘণ্টা এক বাড়ীতে থাকি, মা'র অবস্থা আমার কি আর বুঝতে বাকী আছে। এমনি মা অনেকটা শান্ত হয়ে থাকে। মদ খেলে আর রক্ষা নেই। গিয়ে বাবার সঙ্গে ঝগড়া সুরু করে দেবে। শুনতে পাবার ভয়ে আমি অবশ্য বাগানে পালিয়ে যাই, তবু দু'চারটে কথা কানে আসে তো। আমার মন এমন খারাপ হয়ে যায়।' ক্ষণিকের অবসর নিয়ে আনন্দ আবার বলল, 'বাবা এমন নিষ্ঠুর !'

কাত হয়ে আনন্দের বালিশে গাল রেখে হেরম্ব শুয়েছিল। বালিশে মৃগনাভির মৃদু গন্ধ আছে। মালতীর দুঃখের কাহিনী শুনতে শুনতেও সে স্মরণ করবার চেষ্টা করছিল কস্তূরীগন্ধের সঙ্গে তার মনে কার

স্মৃতি জড়িয়ে আছে। আনন্দের উচ্চারিত নিষ্ঠুর শব্দটা তার মনকে আনন্দের দিকে ফিরিয়ে দিল।

'নিষ্ঠুর?'

'ভয়ানক নিষ্ঠুর। আজ বাবার কাছে একটু ভাল ব্যবহার পেলে মা মদ ছোঁয় না। জেনেও বাবা উদাসীন হয়ে আছেন। এক এক সময় আমার মনে হয়, এর চেয়ে বাবা যদি কোথাও চলে যেতেন তাও ভাল ছিল। মা বোধ হয় তাহলে শান্তি পেত।'

বাবা যদি কোথাও চলে যেতেন! আনন্দও তাহলে প্রয়োজন উপস্থিত হলে নিষ্ঠুর চিন্তাকে প্রশ্রয় দিতে পারে? মালতীর দুঃখের চেয়ে আনন্দের এই নূতন পরিচয়টিই যেন হেরম্বের কাছে প্রধান হয়ে থাকে। তার নানা কথা মনে হয়। মালতীর অবাঞ্ছনীয় পরিবর্ত্তনকে আনন্দ যথোচিতভাবে বিচার করতে অক্ষম নয় জেনে সে সুখী হয়। মালতীর অধঃপতন রহিত করতে অনাথকে পর্য্যন্ত সে দূরে কোথাও পাঠিয়ে দেবার ইচ্ছা পোষণ করে, মালতীর দোষগুলি তার কাছে এতদূর বর্জ্জনীয়। মাতৃত্বের অধিকারে যা খুসী করার সমর্থন আনন্দের কাছে মালতী পায় নি। শুধু তাই নয়। আনন্দের আরও একটি অপূর্ব্ব পরিচয় তার মালতী সম্পর্কীয় মনোভাবের মধ্যে আবিষ্কার করা যায়। মালতীকে সে দোষী বলে জানে, কিন্তু সমালোচনা করে না, তাকে সংস্কৃত ও সংশোধিত করবার শতাধিক চেষ্টায় অশান্তির সৃষ্টি করে না। মালতীকে কিসে বদলে দিয়েছে আনন্দ তা জানে। কিন্তু জানার চেয়েও যা বড় কথা, মনোবেদনার এই বিকৃত অভিব্যক্তিকে সে বোঝে, অনুভব করে। জীবনের এই যুক্তিহীন অংশটিতে যে অখণ্ড যুক্তি আছে

আনন্দের তা অজানা নয়। ওর বিষণ্ণ মুখখানি হেরম্বের কাছে তার প্রমাণ দিচ্ছে।

আনন্দ চুপ করে বসে আছে। তার এই নীরবতার সুযোগে তাকে সে কত দিক দিয়ে কত ভাবে বুঝেছে হেরম্বের মনে তার চুলচেরা হিসাব চলতে থাকে। কিন্তু এক সময় হঠাৎ সে অনুভব করে এই প্রক্রিয়া তাকে যন্ত্রণা দিচ্ছে। আনন্দকে বুদ্ধি দিয়ে বুঝবার চেষ্টায় তার মধ্যে কেমন একটা অনুত্তেজিত অবসন্ন জ্বালা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সম্মুখে পথ অফুরন্ত জেনে যাত্রার গোড়াতেই অশ্রান্ত পথিকের যেমন স্তিমিত হতাশা জাগে, একটা ভারবোধ তাকে দমিয়ে রাখে, সেও তেমনি একটা ঝিমানো চেপে-ধরা কষ্টের অধীন হয়ে পড়েছে। আনন্দের অন্তরঙ্গ প্রশ্রয়ে তার যেন সুখ নেই।

হেরম্ব বিছানায় উঠে বসে। লণ্ঠনের এত কাছে আনন্দ বসেছে যে তাকে মনে হচ্ছে জ্যোতির্ম্ময়ী, আলো যেন লণ্ঠনের নয়। হেরম্ব অসহায় বিপন্নের মত তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সে আরও একটি অভিনব আত্মচেতনা খুঁজে পায়। তার বিহ্বলতার সীমা থাকে না। সন্ধ্যা থেকে আনন্দকে সে যে কেন নানা দিক থেকে বুঝবার চেষ্টা করেছে এতক্ষণে হেরম্ব সে রহস্যের সন্ধান পেয়েছে। ঝ'ড়ো রাত্রির উত্তাল সমুদ্রের মত অশান্ত অসংযত হৃদয়কে এমনি ভাবে সে সংযত করে রাখছে, আনন্দকে জানবার ও বুঝবার এই অপ্রমত্ত ছলনা দিয়ে। আনন্দ যেমনি হোক কি তার এসে যায়? সে বিচার পড়ে আছে সেই জগতে, যে জগৎ আনন্দের জন্যই তাকে অতিক্রম করে আসতে হয়েছে। জীবনে ওর যত অনিয়ম যত অসঙ্গতিই থাক, কিসের সঙ্গে তুলনা করে

সে তা যাচাই করবে? আনন্দকে সে যে স্তরে পেয়েছে সেখানে ওর অনিয়ম নিয়ম, ওর অসঙ্গতিই সঙ্গতি। ওর অনিবার্য্য আকর্ষণ ছাড়া বিশ্বজগতে আজ আর দ্বিতীয় সত্য নেই; ওর হৃদয়মনের সহস্র পরিচয় সহস্রবার আবিষ্কার করে তার লাভ কি হবে? তার মোহকে সে চরম পরিপূর্ণতার স্তরে তুলে দিয়েছে, তাকে আবার গোড়া থেকে সুরু করে বাস্তবতার ধাপে ধাপে চিনে গিয়ে তিল তিল করে মুগ্ধ হবার মানে কি হয়? এ তারই হৃদয়মনের দুর্ব্বলতা। ঈশ্বরকে কৃপাময় বলে কল্পনা না করে যে দুর্ব্বলতার জন্য মানুষ ঈশ্বরকে ভালবাসতে পারে না, এ সেই দুর্ব্বলতা। আনন্দকে আশ্রয় করে যে অপার্থিব অবোধ্য অনুভূতি নীহারিকালোকের রহস্য-সম্পদে তার চেতনাকে পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করে দিতে চায়, পৃথিবীর মাটিতে প্রোথিত সহস্র শিকড়ের বন্ধন থেকে তাকে মুক্তি দিয়ে ঊর্দ্ধায়তঃ জ্যোতিস্তরের মত তাকে উত্তুঙ্গ আত্মপ্রকাশে সমাহিত করে ফেলতে চায়, সেই অব্যক্ত অনুভূতিকে ধারণ করবার শক্তি হৃদয়ের নেই বলে অভিজ্ঞতার অসংখ্য অনভিব্যক্তি দিয়ে তাকেই সে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছে। আকাশকুসুমকে আকাশে উঠে সে চয়ন করতে পারে না। তাই অসীম ধৈর্য্যের সঙ্গে বাগানের মাটিতে তার চাষ করছে। হৃদয়ের একটিমাত্র অবাস্তব বন্ধনের সমকক্ষ লক্ষ বাস্তব বন্ধন সৃষ্টি করে সে আনন্দকে বাঁধতে চায়। সুখদুঃখের অতীত উপভোগকে সে পরিণত করতে চায় তার পরিচিত পুলক-বেদনায়। আজ সন্ধ্যা থেকে সে এই অসাধ্য সাধনে ব্রতী হয়েছে।

আনন্দ পুরাতন প্রশ্ন করল।

'কি ভাবছেন?'

'অনেক কথাই ভাবছি আনন্দ। তার মধ্যে প্রধান কথাটা এই, আমার কি হয়েছে।'

'কি হয়েছে ?'

'কি রকম একটা অদ্ভুত কষ্ট হচ্ছে।'

আনন্দ হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বলল, 'আমারও হয়। নাচবার আগে আমারও ওরকম হয়।'

হেরম্ব উৎসুক হয়ে বলল, 'তোমার কি রকম লাগে ?'

'কি রকম লাগে ?' আনন্দ একটু ভাবল 'তা বলতে পারব না। কি রকম যেন একটা অদ্ভুত— ।'

'আমি কিন্তু বুঝতে পারছি আনন্দ।'

'আমিও আপনারটা বুঝতে পারছি।'

পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে তারা হেসে ফেলল।

আনন্দ বলল, 'আপনার খিদে পায় নি ? কিছু খান।'

হেরম্ব বলল, 'দাও। বেশী দিও না।'

একটি নিঃশব্দ সঙ্কেতের মত আনন্দ যতবার ঘরে আনাগোনা করল, জানালার পাটগুলি ভাল করে খুলে দিতে গিয়ে যতক্ষণ সে জানালার সামনে দাঁড়াল, ঠিক সম্মুখে এসে যতবার সে চোখ তুলে সোজা তার চোখের দিকে তাকাবার চেষ্টা করল—তার প্রত্যেকটির মধ্যে হেরম্ব তার আত্মার পরাজয়কে ভুলে যাবার প্রেরণা আবিষ্কার করল। তার ক্রমে ক্রমে মনে হল, হয়ত এ পরাজয়ের গ্লানি

মিথ্যা। বিচারে হয়ত ভুল আছে। হয়ত জয়-পরাজয়ের প্রশ্নই ওঠে না।

হেরম্বের মন যখন এই আশ্বাসকে খুঁজে পেয়েও সন্দিগ্ধ পরীক্ষকের মত বিচার করে না দেখে গ্রহণ করতে পারছে না, আনন্দ তার চিন্তায় বাধা দিল। আনন্দের হঠাৎ মনে পড়ে গিয়েছে, সিঁড়িতে বসে হেরম্বকে একটা কথা বলবে মনে করেও বলা হয় নি। কথাটা আর কিছুই নয়। প্রেম যে একটা অস্থায়ী জোরালো নেশা মাত্র হেরম্ব এ খবর পেল কোথায়! একটু আগেও একথাটা জিজ্ঞাসা করতে আনন্দের লজ্জা হচ্ছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য দেখুন হেরম্ববাবু, এখন তার একটুও লজ্জা করছে না।

'আপনাকে সত্যি কথাটা বলি। সন্ধ্যার সময় আপনাকে যে বন্ধু বলেছিলাম, সেটা বানানো কথা। এতক্ষণে আপনাকে বন্ধু মনে হচ্ছে।'

'এখন কত রাত্রি?'

'কি জানি। দশটা সাড়ে দশটা হবে। ঘড়ী দেখে আসব?'

'থাক। আমার কাছে ঘড়ী আছে। দশটা বাজতে এখনো তেরো মিনিট বাকী।'

আনন্দ বিস্মিতা হয়ে বলল, 'ঘড়ী আছে, সময় জিজ্ঞেস করলেন যে?'

হেরম্ব হেসে বলল, 'তুমি ঘড়ী দেখতে জান কিনা পরখ করছিলাম। মালতী-বৌদির সাড়াশব্দ যে পাচ্ছি না?'

আনন্দও হাসল। বলল, 'অত বোকা নই, বুঝলেন? এমনি করে আমার কথাটা এড়িয়ে যাবেন, তা হবে না। রোমিও জুলিয়েট বেঁচে

থাকলে তাদের প্রেম অল্পদিনের মধ্যে মরে যেত, আপনি কি করে জানলেন বলুন।'

হেরম্ব এটা আশা করে নি। লজ্জা না করার অভিনয় করতে আনন্দের যে প্রাণান্ত হচ্ছে, এটুকু ধরতে না পারার মত শিশুচোখ হেরম্বের নয়। একবার মরিয়া হয়ে সে এ প্রশ্ন করছে, তার সম্বন্ধে এই সুস্পষ্ট ব্যক্তিগত প্রশ্নটা। তার এ সাহস অতুলনীয়। কিন্তু প্রশ্নটা চাপা দিয়েও আনন্দের সরস-তিক্ত অনুসন্ধিৎসাকে চাপা দেওয়া গেল না দেখে হেরম্ব অবাক হয়ে রইল।

'বুদ্ধি দিয়ে জানলাম।' হেরম্ব এই জবাব দিল।

'শুধু বুদ্ধি দিয়ে?'

'শুধু বুদ্ধি দিয়ে, আনন্দ। বিশ্লেষণ করে।' আনন্দের বালিশ থেকে সদ্য-আবিষ্কৃত লম্বা চুলটির একপ্রান্ত আঙুল দিয়ে চেপে ধরে ফুঁ দিয়ে উড়িয়ে সেটিকে হেরম্ব সোজা করে রাখল।

'জল খেয়ে আসি।' বলে আনন্দ গেল পালিয়ে।

হেরম্ব তখন আবার ভাবতে আরম্ভ করল যে কোন্ অজ্ঞাত সত্যকে আবিষ্কার করতে পারলে তার হৃদয়ের চিরন্তন পরাজয়, জয়-পরাজয়ের স্তরচ্যুত হয়ে সকল পার্থিব ও অপার্থিব হিসাবনিকাশের অতীত হয়ে যেতে পারে। চোখ দিয়ে দেখে, স্পর্শ দিয়ে অনুভব করে, বুদ্ধি দিয়ে চিনে ও হৃদয় দিয়ে কামনা করে, মর্ত্ত্যলোকের যে-আত্মীয়তা আনন্দের সঙ্গে তার স্থাপিত হওয়া সম্ভব, আত্মার অতীন্দ্রিয় উদাত্ত আত্মীয়তার সঙ্গে তার তুলনা কোথায় রহিত হয়ে গেছে। কোন হৃস্ব যুক্তি, সীমারেখার মত, এই দুটি মহাসত্যকে এমন ভাবে ভাগ করে দিয়েছে যে,

তাদের অস্তিত্ব আর পরস্পর-বিরোধী হয়ে নেই, তাদের একটি অপরটিকে কলঙ্কিত করে দেয় নি।

আনন্দের ফিরে আসতে দেরী হয়। হেরম্বের ব্যাকুল অন্বেষণ তার দেহকে অস্থির করে দেয়। বিছানা থেকে নেমে সে ঘরের মধ্যে পায়চারী আরম্ভ করে। এদিকের দেয়াল থেকে ওদিকের দেয়াল পর্য্যন্ত হেঁটে যায়, থমকে দাঁড়ায় এবং প্রত্যাবর্ত্তন করে। তিনটি খোলা জানালা প্রত্যেকবার তার চোখের সামনে জ্যোৎস্নাপ্লাবিত পৃথিবীকে মেলে ধরে। কিন্তু হেরম্বের এখন উপেক্ষা অসীম। সম্মুখের সুদূর সাদা দেয়ালটির আধহাতের মধ্যে এসে সে গতিবেগ সংযত করে, আর কিছুই দেখতে পায় না। মেঝেতে আনন্দের পরিত্যক্ত একটি ফুল তার পায়ের চাপে পিষে যায়।

হেরম্ব জানে, আলো এই অন্ধকারে জ্বলবে। তাকে চমকে না দিয়ে বিনা আড়ম্বরে তার হৃদয়ে পরম সত্যটির আবির্ভাব হবে। তার সমস্ত অধীরতা অপমৃত্যু লাভ করবে না, ঘুমিয়ে পড়বে। জীবনের চরম জ্ঞানকে সুলভ ও সহজ বলে জেনে সে তখন ক্ষুণ্ণ অথবা বিস্মিত পর্য্যন্ত হবে না। কিন্তু তার দেরী কত ?

ফিরে এসে তার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করে আনন্দ অবাক হয়ে গেল। কিন্তু কথা বলল না। বিছানার একপাশে বসে তার অস্থির পাদচারণাকে দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করতে লাগল। হেরম্ব বহুদিন হল তার চুলের যত্ন নিতে ভুলে গেছে। তবু তার চুলে এতক্ষণ যেন একটা শৃঙ্খলা ছিল। এখন তাও নেই। তাকে পাগলের মত চিন্তাশীল দেখাচ্ছে। আনন্দের সামনে এমনিভাবে সে যেন কত যুগ ধরে ক্ষ্যাপার মত অসংলগ্ন পদ-

বিক্ষেপে হেঁটে হেঁটে শুধু ভেবে গিয়েছে। পৃথিবীতে বাস করার অভ্যাস যেন তার নেই। প্রবাসে আপনার অনির্ব্বচনীয় একাকীত্বের বেদনায় এমনি প্রগাঢ় ঔৎসুক্যের সঙ্গে সে সর্ব্বদা স্বদেশের স্বপ্ন দেখে।

আনন্দের আবির্ভাব হেরম্ব টের পেয়েছিল। কিন্তু সে যে মানসিক অবস্থায় ছিল তাতে এই আবির্ভাব কিছুক্ষণের জন্য মূল্যহীন হয়ে থাকতে বাধ্য।

হেরম্ব হঠাৎ তার সামনে দাঁড়াল।

'ব্যায়াম করছি আনন্দ।'

'ব্যায়াম শেষ হয়ে থাকলে বসে বিশ্রাম করুন।'

হেরম্ব তৎক্ষণাৎ বসল। বলল, 'তুমি বার বার মুখ ধুয়ে আসছ কেন?'

'মুখে ধূলো লাগে যে।' আনন্দ হাসবার চেষ্টা করল।

তাদের অদ্ভুত নিরবলম্ব অসহায় অবস্থাটি হেরম্বর কাছে হঠাৎ প্রকাশ হয়ে যায়। তাদের কথা বলা অর্থহীন, তাদের চুপ করে থাকা ভয়ঙ্কর। পায়ের তলা থেকে তাদের মাটি প্রায় সরে গেছে, তাদের আশ্রয় নেই। মানুষের বহুযুগের গবেষণাপ্রসূত সভ্যতা আর তারা ব্যবহার করতে পারছে না। দর্শন, বিজ্ঞান, সমাজ ও ধর্ম্ম, এমন কি, ঈশ্বরকে নিয়ে পর্য্যন্ত তাদের আলাপ আলোচনা অচল, এতদূর অচল যে, পাঁচ মিনিট ওসব বিষয়ে চেষ্টা করে কথা চালালে নিজেদের বিশ্রী অভিনয়ের লজ্জায় তারা কণ্টকিত হয়ে উঠবে। এই কক্ষের বাইরে জ্ঞান নেই, সমস্যা নেই, প্রয়োজনীয় কিছু নেই,—মানুষ পর্য্যন্ত নেই। তাদের কাছে বাইরের জগৎ মুছে গেছে, আর সে জগতকে কোন ছলেই

এঘরে টেনে আনা যাবে না। একান্ত ব্যক্তিগত কথা ছাড়া তাদের আর বলবার কিছু নেই। অথচ, এই সীমাবদ্ধ আলাপেও যে কথাগুলি তারা বলতে পারছে সেগুলি বাজে, অবান্তর। বোমার মত ফেটে পড়তে চেয়ে তাদের তুড়ি দিয়ে খুসী থাকতে হচ্ছে।

এ অবস্থা যে সুখের নয়, কাম্য নয়, হেরম্বের তা স্বীকার করতে হল। কিন্তু ক্ষতিপূরণ যে এই অসুবিধাকে ছাপিয়ে আছে একথা জানতেও তার বাকী ছিল না। পরস্পরের কত অনুচ্চারিত চিন্তাকে তারা শুনতে পাচ্ছে। তাদের কত প্রশ্ন ভাষায় রূপ না নিয়েও নিঃশব্দ জবাব পাচ্ছে। সাড়ীর প্রান্ত টেনে নামিয়ে পায়ের পাতা ঢেকে দিয়ে সে বলছে, পা দু'টি তার অত করে দেখবার মত নয়; আঁচলের তলে হাত দু'টি আড়াল করে বলছে, পা দেখতে দিলাম না বলে তুমি অমন করে আমার হাতের দিকে তাকিয়ে থাকবে, তা হবে না। সে তার মুখের দিকে চেয়ে জবাব দিচ্ছে: এবার তুমি মুখ ঢাকো কি করে দেখি! আনন্দের মৃদু রোমাঞ্চ ও আরক্ত মুখ প্রতিবাদ করে বলছে, আমাকে এমন করে হার মানানো তোমার উচিত নয়। দরজার দিকে চেয়ে আনন্দ ভয় দেখাচ্ছে, আমি ইচ্ছে করলেই উঠে চলে যেতে পারি।

হঠাৎ তার মুখে বিষণ্ণতা ঘনিয়ে আসছে। তার চোখ ছলছল করে উঠছে। চোখের পলকে সে অন্যমনস্ক হয়ে গেল। এও ভাবা, সুস্পষ্ট বাণী। কিন্তু এর অর্থ অতল, গভীর, রহস্যময়। তার কত ভয়, কত প্রশ্ন, নিজের কাছে হঠাৎ নিজেই দুর্ব্বোধ্য হয়ে উঠে তার কি নিদারুণ কষ্ট, হেরম্ব কি তা জানে? তার মন কতদূর উতলা হয়ে উঠেছে হেরম্ব কি তার সন্ধান রাখে? একটা বিপুল সম্ভাবনা গুহা-নিরুদ্ধ নদীর মত

তাকে যে ভেঙ্গে ফেলতে চাচ্ছে, হেরম্ব তাও কি জানে? হয়ত আজ থেকেই তার চিরকালের জন্য দুঃখের দিন সুরু হল, এ আশঙ্কা যে তার মনে জ্বালার মত জেগে আছে, হেরম্ব কি তা কল্পনাও করতে পারে?

নিঃশব্দ নির্ম্মম হাসির সঙ্গে উদাসীন চোখে খোলা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে থেকে হেরম্ব জবাব দিচ্ছে: দুঃখকে ভয় করো না! দুঃখ মানুষের দুর্লভতম সম্পদ! তাছাড়া, আমি আছি। আমি!

কথার অভাবে তাদের দীর্ঘতম নীরবতার শেষে আনন্দ বলল, 'চলুন নাচ দেখবেন।'

আনন্দের নাচ যে বাকী আছে সে কথা হেরম্বের মনে ছিল না।

'চল। বেশ পরিবর্ত্তন করবে না?'

'করব। আপনি বাইরে গিয়ে বসুন।'

হেরম্ব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। অনাথের ঘরের সামনে দিয়ে যাবার সময় ভেজানো জানালার ফাঁক দিয়ে সে দেখতে পেল এককোণে মেরুদণ্ড টান করে নিস্পন্দ হয়ে সে বসে আছে। জীবনে বাহুল্যের প্রয়োজন আছে। কত বিচিত্র উপায়ে মানুষ এ প্রয়োজন মেটায়!

বাড়ীর বাইরে গিয়ে মন্দিরের সামনে ফাঁকা জায়গায় হেরম্ব দাঁড়াল। ইতিমধ্যে এখানে অনেক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়ে গেছে। তা যদি না হয়ে থাকে, তবে হেরম্বের চোখেরই পরিবর্ত্তন হয়েছে নিশ্চয়। মন্দির ও বাড়ীর শ্যাওলার আবরণ এক প্রস্থ ছায়ার আস্তরণের মত দেখাচ্ছে।

বাগানে তরুতলের রহস্য আরও ঘন আরও মর্ম্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। আনন্দ যে ঘাসের জমিতে নাচবে সেখানে জ্যোৎস্না পড়েছে আর পড়েছে দেবদারু গাছটার ছায়া। সমুদ্রের কলরব ক্ষীণভাবে শোনা যাচ্ছে। রাত্রি আরও বাড়লে, চারিদিক আরও স্তব্ধ হয়ে এলে, আরও স্পষ্টভাবে শোনা যাবে।

পৃথিবীতে চিরদিন এই সঙ্কেত ও সঙ্গীত ছিল, চিরদিন থাকবে। মাঝখানে শুধু কয়েকটা বছরের জন্য নিজেকে সে উদাসীন করে রেখেছিল। সে মরে নি, ঘুমিয়ে পড়েছিল মাত্র। ঘুম ভেঙ্গে, দুঃস্বপ্নের ভগ্নস্তূপকে অতিক্রম করে সে আবার স্তরে স্তরে সাজানো সুন্দর রহস্যময় জীবনের দেখা পেয়েছে। যে স্পন্দিত বেদনা প্রাণ ও চেতনার একমাত্র পরিচয় আজ আর হেরম্বের তার কোন অভাব নেই।

হেরম্ব মন্দিরের সিঁড়িতে বসল।

আনন্দের প্রতীক্ষায় অধীর হয়ে বাড়ীর দরজায় সে চোখ পেতে রাখল না। আনন্দ বেশ পরিবর্ত্তন করেই বাইরে এসে তাকে নাচ দেখাবে, চঞ্চল হয়ে ওঠার কোন কারণ নেই। এই সংক্ষিপ্ত বিরহটুকু তার বরং ভালই লাগছে। আনন্দ যদি আসতে দেরীও করে সে ক্ষুণ্ণ হবে না।

আনন্দ দেরী না করেই এল। চাঁদের আলোয় তাকে পরীক্ষা করে দেখে হেরম্ব বলল, 'তুমি তো কাপড় বদলাও নি আনন্দ ?'

'না। শুধু জামা বদলে এলাম। কাপড়ও অন্যরকম করে পরেছি বুঝতে পারছেন না ?'

'বুঝতে পারছি।'

'কি রকম দেখাচ্ছে আমাকে ?'

'তা কি বলা যায় আনন্দ ?'

হেরম্ব সিঁড়ির উপরের ধাপে বসেছিল। তার পায়ের নীচে সকলের তলার ধাপে আনন্দ বসতেই সেও নেমে এল। আনন্দ চেয়ে না দেখেই একটু হাসল।

হেরম্ব কোন কথা বলল না। আনন্দের এখন নীরবতা দরকার এটা সে অনুমান করেছিল। হাঁটুর সামনে দু'টি হাতকে একত্র বেঁধে আনন্দ বসেছে। তার ছড়ানো বাবড়ি চুল কান ঢেকে গাল পর্য্যন্ত ঘিরে আসছে। তার ছোট ছোট নিশ্বাস নেবার প্রক্রিয়া চোখে দেখা যায়।

আনন্দ এক সময়ে নিশ্বাস ফেলে বলে, 'জামা-কাপড়! কি ছোট মন আমাদের!'

'আমাদের, আনন্দ।'

'না, আমাদের। এসব সৃষ্টি করেছি আমরা। এ আমাদের এক-ধরণের ছল।'

নিঃশব্দে সময় অতিবাহিত হয়ে যায়। তারা চুপ করে বসে থাকে। আনন্দকে চমকে দেবার ভয়ে হেরম্ব নড়তে সাহস পায় না। জোরে নিশ্বাস ফেলতে গিয়ে চেপে যায়। আকাশে চাঁদ গতিহীন। আনন্দের নাচের প্রতীক্ষায় হেরম্বের মনেও সমস্ত জগৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে।

তারপর এক সময় আনন্দ উঠে গেল। ঘাসে-ঢাকা জমিতে গিয়ে চাঁদের দিকে মুখ করে সে হাঁটু পেতে বসল। প্রণামের ভঙ্গীতে মাথা মাটিতে নামিয়ে দু'হাত সম্মুখে প্রসারিত করে স্থির হয়ে রইল।

আনন্দ কতক্ষণ নৃত্য করল হেরম্বের সে খেয়াল ছিল না।

চাঁদের আলো তার চোখে নিভে নিভে ম্লান হয়ে এসেছিল নাচের গোড়াতেই। এটা তার কল্পনা অথবা আকাশের চাঁদকে মেঘে আড়াল করেছিল, হেরম্ব বলতে পারবে না। কিন্তু শ্লথ, মন্থর গতিছন্দ থেকে আনন্দের নৃত্য চঞ্চল হতে চঞ্চলতর হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জ্যোৎস্নাও যে উজ্জ্বল হতে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছিল একথা হেরম্ব নিঃসংশয়ে বলতে পারে। হয়ত চোখে তার ধাঁধা লেগেছিল। হয়ত চন্দ্রকলা-নৃত্যের শোনা ব্যাখ্যাটি তার মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পূর্ণিমা থেকে আনন্দ কিন্তু অমাবস্যায় ফিরে যেতে পারে নি।

নৃত্য যখন তার চরম আবেগে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে, তার সর্ব্বাঙ্গের আলোড়িত সঞ্চালন এক ঝলক আলোর মত প্রখর দ্রুততায় হেরম্বের বিস্ময়চকিত দৃষ্টির সামনে চমক সৃষ্টি করছে, ঠিক সেই সময় অকস্মাৎ সে থেমে গেল।

ঘাসের উপর বসে তাকে হাঁপাতে দেখে হেরম্ব তাড়াতাড়ি উঠে তার কাছে গেল।

'কি হল, আনন্দ?'

'ভয় করছে।' আনন্দ বলল। রুদ্ধস্বরে, কান্নার মত করে।

সে থর থর করে কাঁপছে। তার মুখ আরক্ত, সর্ব্বাঙ্গ ঘামে ভেজা। তার দু'চোখে উত্তেজিত অসংযত চাহনি। চুলগুলি তার মুখে এসে পড়ে ঘামে জড়িয়ে গিয়েছিল। চুল পিছনে সরিয়ে হেরম্ব তার কানের পাশে

আটকে দিল। তাকে দম নেবার সময় দিয়ে বলল, 'ভয় করছে? কেন ভয় করছে, আনন্দ?'

আনন্দ বলল, 'কি জানি। হঠাৎ সমস্ত শরীর আমার কেমন করে উঠল! মনে হল, এইবার আমি মরে যাব। মরে যেতে আমার কখনও ভয় হয় নি। আজ কেন যে এরকম করে উঠল। অন্য দিন নাচের পর ঘুম আসে। আজ শরীর জ্বালা করছে।'

'গরম লাগছে?'

'না। ঝাঁঝের মত জ্বালা করছে,—হাড়ের মধ্যে। আমি এখন কি করি! কেন এরকম হল?'

'একটু বিশ্রাম করলেই সেরে যাবে। শোবে আনন্দ? শুয়ে পড়লে হয়ত—'

আনন্দ হেরম্বের কোলে মাথা রেখে ঘাসের উপর শুয়ে পড়ল। তার নিশ্বাস ক্রমে ক্রমে সরল হয়ে আসছে, কিন্তু মুখের অস্বাভাবিক উত্তেজনার ভাব একটুও কমে নি। হেরম্বের চোখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতেই তার দু'চোখ জলে ভরে গেল।

'এরকম হল কেন আজ? তোমার জন্যে?'

'হতে পারে। আমি তো সহজ লোক নই। পৃথিবীতে আমার জন্যে অনেক কিছুই হয়েছে।'

অন্ধ যে ভাবে আশ্রয় খোঁজে, আনন্দ তেমনি ব্যাকুল ভঙ্গিতে তার দুটি হাত বাড়িয়ে দিল। হেরম্বের হাতের নাগাল পেতেই শক্ত করে চেপে ধরে সে যেন একটু স্বস্তি পেল।

'ঠিক করে কিছুই বুঝতে পারছি না। আরও যেন কত কি দুঃখ একসঙ্গে ভোগ করছি। আচ্ছা তুমি তো কবি, তুমি কিছু বুঝতে পারছ না?'

'আমি কবি নই, আনন্দ। আমি সাধারণ মানুষ।'

আনন্দ তার এই সবিনয় অস্বীকারের প্রতিবাদ করল।

'তুমি আমার কবি। কবি না হলে কেউ এমন ঠাণ্ডা হয়? সন্ধ্যার সময় তোমাকে দেখেই আমি চিনেছিলাম। তুমি না থাকলে আমি এখন এখানে গড়াগড়ি দিয়ে কেঁদে নাচের জ্বালায় জ্বলে জ্বলে মরে যেতাম।'

'জ্বালা কমে নি আনন্দ?'

'কমেছে।'

'নাচ শেষ করবে?'

'না। নাচ শেষ করে ঘুমোবে কে? তার চেয়ে এ কষ্টও ভাল। ঘুম তো মরে যাওয়ার সমান, শুধু সময় নষ্ট।'

আনন্দ হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে বলল, 'ক'টা বাজল? অনেক দূরে থানায় ঘণ্টা বাজছে। ক'টা বাজল শুনলে?'

হেরম্ব বলল, 'ও ঘণ্টা ভুল, আনন্দ। এখন ঠিক মাঝরাত্রি।'

আনন্দ বলল, 'তাই হবে, চাঁদটা আকাশের ঠিক মাঝখানে এসেছে।'

ওইখানে, আকাশের চাঁদের কাছে পৌঁছে, আনন্দ একেবারে নির্ব্বাক হয়ে গেল। হেরম্বের দেহের আশ্রয়ে নিজের দেহকে আরও নিবিড়ভাবে সমর্পণ করে সে আকাশের নিষ্প্রভ তারা আবিষ্কারের চেষ্টা করতে লাগল।

হেরম্ব এখন তাও জানে। তাই তার গালের উত্তেজনা, তার চিবুকের মনোরম কুঞ্চন, তার স্বপ্নাতুর চোখে কালো ছায়ার গাঢ় অতল রহস্য মিথ্যা নয়। তার ওষ্ঠে তাই শুধু স্পর্শই নয়, জ্যোৎস্নাও আছে। ওর মুখের প্রত্যেকটি অণুর সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছা আর তাই অর্থহীন নয়। এমন একটি মুখকে তিল তিল করে মনের মধ্যে সঞ্চয় করায় আর অপরাধ নেই, সময়ের অপচয় নেই।

এতকাল হেরম্ব এক মুহূর্ত্ত বিশ্লেষণ ছাড়া থাকতে পারে নি। সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর হয়ে এসে এবার তার বিশ্লেষণ-লব্ধ সত্য সূক্ষ্মতার সীমায় পৌঁছেছে। আর তার কিছুই বুঝবার ক্ষমতা নেই। কিন্তু হেরম্বের আপশোষ তা নয় : এই অক্ষমতার পরিচয় তার জানা : এই তার চরম জ্ঞান। সে বিজ্ঞান মানে, আজ বৈজ্ঞানিকের মন নিয়ে কাব্যকে মানল। চোখ যখন আছে, চোখ দেখুক। দেহ যখন আছে, দেহে রোমাঞ্চ হোক। হেরম্ব গ্রাহ্য করে না। অনাবৃত আনন্দের দেহ থেকে জ্যোৎস্নার আবরণ আজ কিসে ঘোচাতে পারবে? লক্ষ আলিঙ্গনও নয়, কোটি চুম্বনও নয়।

'আছেন' বললে ঈশ্বর অস্তিত্ব পান এবং সে অস্তিত্ব মিথ্যা নয়, কারণ 'আছেন' বলাটাই স্ব-সম্পূর্ণ সত্য, আর কোন প্রমাণসাক্ষেপ সত্যের উপর নির্ভরশীল নয়। হেরম্বের প্রেমও শুধু আছে বলেই সত্য। কল্পনার সীমা আছে বলে নয়, যে অনুভূতির স্রোত তার জীবন তার ঐতিহাসিকতায় নেই বলে নয়, নিজের সমগ্র সচেতন আমিত্ব দিয়ে আয়ত্ত করতে পারছে না বলে নয় : প্রেম আছে বলে প্রেম আছে। কাম-পঙ্কের পদ্ম এর উপমা নয়। মানুষের মধ্যে যতখানি মানুষের নাগালের বাইরে, প্রেম তারই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

প্রেমকে হেরম্ব অনুভব করছে না, উপলব্ধি করছে না, চিন্তা করছে না,—সে প্রেম করছে। এ তার নব ইন্দ্রিয়ের নবলব্ধ ধর্ম্ম।

আনন্দের মুখে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, দু'হাতের তালুতে পৃথিবীর সবুজ নমনীয় প্রাণবান তৃণের স্পর্শ অনুভব করে হেরম্ব খুসী হয়ে উঠল। প্রশান্ত চিত্তে সে ভাবল, পূর্ণিমার নাচ শেষ করে অমাবস্থায় ফিরে না গিয়ে আনন্দ ভালই করেছে।

তৃতীয় ভাগ

দিবারাত্রির কাব্য

অন্ধকারে কাঁদিছে উর্ব্বশী,
কান পেতে শোন বন্ধু শ্মশানচারিণী,
মৃত্যু-অভিসারিকার গান।
'সব্যসাচি! আমি উপবাসী!'
বলি অঙ্গে ভস্ম মাখে সৃষ্টির স্বৈরিণী,
হিমে তাপে মাগে পরিত্রাণ।

'সব্যসাচি! আমি ক্ষুধাতুরা,
শ্মশানের প্রান্ত-ঘেঁষা উত্তর-বাহিনী
নদীস্রোতে চলেছি ভাসিয়া,
মোর সর্ব্ব ভবিষ্যত-ভরা
ব্যর্থতার পরপারে।—কে কহে কাহিনী-
মোর লাগি রহিবে বসিয়া?'

জলের সমুদ্র নয়, আরও উন্মাদ হৃদয়-সমুদ্রের কলরবে মাঝরাত্রি পার না হলে হেরম্বের ঘুম আসে না। তবু আজ প্রত্যূষেই তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুমের প্রয়োজন আছে কিন্তু ঘুম আসবে না, শুয়ে শুয়ে সে কষ্ট ভোগ করার চেয়ে উঠে বসে চুরুট ধরানোই হেরম্ব ভাল মনে করল। কাল গিয়েছে কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর রাত্রি। আনন্দের পূর্ণিমা-নৃত্যের পরবর্ত্তী অমাবস্যা সম্ভবতঃ আজ দিনের বেলাই কোন এক সময়ে সুরু হয়ে যাবে।

হেরম্ব উঠে গিয়ে জানালায় দাঁড়ায়। গাছের ফাঁক দিয়ে দেখা যায় বাগানের অপর প্রান্তে আনন্দ ফুল তুলছে। দেখে হেরম্বের খুসী হয়ে ওঠার কথা, কিন্তু আগামী সমস্ত দিনটির কল্পনায় সে বিষণ্ন হয়েই থাকে। দিনের বেলাটা এখানে হেরম্বের ভাল লাগে না। উৎসবের পর সামিয়ানা নামানোর মত নিরুৎসব কর্ম্ম-পদ্ধতিতে সারাদিন এখানকার সকলে ব্যাপৃত হয়ে থাকে, হেরম্বের সুদীর্ঘ সময় বিরক্তিতে পূর্ণ হয়ে যায়। সকালে মন্দিরে হয় ভক্ত-সমাগম। লাল চেলী পরে কপালে রক্তচন্দনের তিলক এঁকে মালতী তাদের বিতরণ করে পুণ্য, অভয় চরণামৃত এবং মাহুলী। চন্দন ঘষে, নৈবেদ্য সাজিয়ে প্রদীপ জ্বেলে ও ধূপধুনো দিয়ে আনন্দ মাকে সাহায্য করে, হেরম্বকে খেতে দেয়,

অনাথের জন্য এক-পাকের রান্না চড়ায় আর নিজের অসংখ্য বিস্ময়কর ছেলেমানুষী নিয়ে মেতে থাকে। ফুলগাছে জল দেয়, আঁকুশী দিয়ে গাছের উঁচু ডালের ফল পাড়ে, কোঁচড়ভরা ফুল নিয়ে মালা গেঁথে গেঁথে অনাথের কাছে বসে গল্প শোনে।

হেরম্বের পাকা মন, যা আনন্দের সংশ্রবে এসে উদ্বেল আনন্দে কাঁচা হয়ে যেতে শিখেছে, খারাপ হয়ে যায়। সে কোনদিন ঘরে বসে ঝিমায়, কোনদিন বেরিয়ে পড়ে পথে।

জগন্নাথের বিস্তীর্ণ মন্দির-চত্বরে, সাগরসৈকতের বিপুল উন্মুক্ততায়, আপনার হৃদয়ের খেলা নিয়ে সে মেতে থাকে। মিলন আর বিরহ, বিরহ আর মিলন। দেয়ালের আবেষ্টনীতে ধূপগন্ধী অন্ধকারে বন্দী জগন্নাথ, আকাশের সমুদ্রের দিকহীন ব্যাপ্তির দেবতা। পথে কয়েকটি বিশিষ্ট অবসরে সুপ্রিয়াকেও তার স্মরণ করতে হয়। কাব্যোপজীবীর দৈহিক ক্ষুধাতৃষ্ণা নিবারণের মত এক অনিবার্য্য বিচিত্র কারণে সুপ্রিয়ার চিন্তাও মাঝে মাঝে তার কাছে প্রয়োজনীয় হয়ে ওঠে। এই বাড়ী আর বাগানের আবেষ্টনীর মধ্যে সে যতক্ষণ থাকে, পর্য্যায়ক্রমে তীব্র আনন্দ ও গাঢ় বিষাদে সে এমনি আচ্ছন্ন হয়ে থাকে যে তার চেতনা আনন্দকে অতিক্রম করে সুপ্রিয়াকে খুঁজে পায় না। পথে বার হয়ে অন্যমনে হাঁটতে হাঁটতে সে যখন সহরের শেষ সীমা সাদা বাড়ীটির কাছে পৌছয়, তখন থেকে সুরু করে তার মন ধীরে ধীরে পার্থিব বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। সে স্পষ্ট অনুভব করে, একটা রঙীন, স্তিমিত আলোর জগৎ থেকে সে পৃথিবীর দিবালোকে নেমে আসছে। ধূলিসমাচ্ছন্ন পথ, দু'দিকের দোকানপাট, পথের জনতা তার কাছে এতক্ষণ ফোকাস-ছাড়া

দূরবীণের দৃশ্যপটের মত ঝাপ্‌সা হয়ে ছিল, এতক্ষণে ফোকাস ঠিক হয়ে সব উজ্জ্বল ও স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। পৃথিবীতে সে যে একা নয়, শোণিত-সুরা-সন্তপ্ত হৃদয় নিয়ে জীবনের চিরন্তন ও অনভিনব সুখদুঃখে বিচলিত অসংখ্য নরনারী যে তাকে ঘিরে আছে, এই অনুভূতির শেষ পর্য্যায়ে জীবনের সাধারণ ও বাস্তব ভিত্তিগুলির সঙ্গে হেরম্বের নূতন করে পরিচয় হয়। সুপ্রিয়া হয়ে থাকে এই পরিচয়ের মধ্যবর্ত্তিনী কান্তা, রৌদ্রতপ্ত দিনের ধূলিরুক্ষ কঠোর বাস্তবতায় একটি কাম্য পানীয়ের প্রতীক।

কোন দিন বাইরে প্রবল বর্ষা নামে। মন্দির ও সমুদ্র জীবন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে যায়। ঘরের মধ্যে বিছানো লোমশ কম্বলে বসে আনন্দ ঝিনুকের রাশি গোণে এবং বাছে, ডান হাত আর বাঁ হাতকে প্রতিপক্ষ করে খেলে জোড়-বিজোড়। দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসে হেরম্ব চুরুট খায় আর নিরানন্দ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আনন্দের খেলা চেয়ে দেখে। এই বিরহ-বিপন্ন বিষণ্ণ মুহূর্ত্তগুলিতেও তার যে দৃষ্টির প্রখরতা কমে যায় তা নয়। আনন্দের স্বচ্ছপ্রায় নখের তলে রক্তের আনাগোনা তার চোখে পড়ে, অধরোষ্ঠের নিগূঢ় অভিপ্রায়ের সে মর্ম্মোদ্‌ঘাটন করে, কপালে ছেলেখেলার হারজিতের হিসাবগুলিকে গোণে। ঘরের আলো বর্ষার মেঘে স্তিমিত হয়ে থাকে।

আনন্দ শ্রান্তস্বরে বলে, 'কি বৃষ্টিই নেমেছে। সমুদ্রটা পর্য্যন্ত বোধ হয় ভিজে গেল।'

হেরম্ব কথা বলে না। আনন্দের বর্ষা-বিরাগে তার দিন আরও কাটতে চায় না।

চুরুটের গন্ধে আনন্দ মুখ ফিরিয়ে জানালার দিকে তাকাল। হেরম্ব ভাবল, আনন্দ হয়ত হাতছানি দিয়ে তাকে ডাকবে। এখন বাগানে যেতে অস্বীকার করার জন্য হেরম্ব নিজেকে প্রস্তুত করছে, আনন্দ মৃদু হেসে মাথা নাড়ল, যার সুস্পষ্ট অর্থ, এখন হেরম্বের বাগানে যাবার দরকার নেই : দূরত্বই ভাল, এই ব্যবধান। হেরম্ব চুরুটটা ফেলে দিয়ে সরে গেল। কাছাকাছি না গেলে চাওয়া-চাওয়িও এখন না হলে চলবে।

গামছা কাপড় নিয়ে হেরম্ব খিড়কির দরজা দিয়ে বার হয়ে বাড়ীর পূবদিকের পুকুরে স্নান করে এল। বাড়ীতে ঢুকে দেখল, বাগান থেকে ঘরে এসে আনন্দ অনাথের কাছে গল্প শুনতে বসেছে। হেরম্বও একপাশে বসে পড়ল। গল্প শোনার প্রত্যাশায় নয় : অনাথের বলা ও আনন্দের শোনা দেখবার জন্য।

অনাথ আজ মেয়েকে নচিকেতার কাহিনী শোনাচ্ছে।

—'তস্য হ নচিকেতা নাম পুত্র আস। বাজশ্রবসের নচিকেতা নামে এক পুত্র ছিল। একবার এক যজ্ঞ করে বাজশ্রবস নিজের সর্ব্বস্ব দান করলেন। দক্ষিণা দেবার সময় হলে নচিকেতা—স হোবাচ পিতরং তত কস্মৈ মান্দাস্যতীতি, আমায় কাকে দেবেন? নচিকেতা তিনবার এ প্রশ্ন করলে বাজশ্রবস রাগ করে বললেন, তোমায় যমকে দেব।'

হেরম্ব মৃদুস্বরে বলল, 'যম নয়, মৃত্যুকে।'

আনন্দ বলল, 'তফাৎ কি হল?'

হেরম্ব বলল, 'উপনিষদে মৃত্যু শব্দটা আছে।'

আনন্দ তার এই বিদ্যার পরিচয়ে মুগ্ধ হল না। বলল, 'তারপর কি হল বাবা?'

হেরম্বের মনে হয়, আনন্দ তাকে অবহেলা করেছে। তার অস্তিত্বকে আনন্দের এ পরিপূর্ণ বিস্মরণ। বাগানে আনন্দের ঘাড় নাড়া ধরলে এই নিয়ে দু'বার হল। সকালের সুরু দেখে আজকের দিনটি হেরম্ব মোটামুটি নিরানন্দের মধ্যে কাটিয়ে দেবারও আশা করতে পারে না।

এদিকে মালতী এসে নচিকেতার কাহিনীতে বাধা জন্মায়।

'তারপর কি হল বাবা! কচি খুকীর মত সকালে উঠে গল্পো গিলছিস্? স্নান-টান করে মন্দিরটা খোল না গিয়ে! কাজের সময় গপ্পো কি?'

অনাথ বলে, 'এমনি করে বুঝি বলতে হয় মালতী?'

'কি করে বলব তবে? একটা কাজ করতে বলার জন্য পেটের মেয়ের কাছে গলবস্ত্র হতে হবে?'

অনাথ চুপ করে যায়। আনন্দ স্নানের উদ্দেশ্যে চলে যায় পুকুরে। তার পরিত্যক্ত স্থানটি দখল করে বসে মালতী। হেরম্বের মনে হয়, সেও বুঝি অনাথের কাছে গল্পই শুনতে চায়। যে-কোন কাহিনী।

হেরম্বের আবির্ভাবে এদের দু'জনের সম্পর্কে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নি। অনাথের অসঙ্গত অবহেলার জবাবে মালতীর স্বেচ্ছাচারিতা যেমন উগ্র ছিল তেমনি উগ্র হয়েই আছে। কিন্তু তার সমস্ত রুক্ষ আচরণের মধ্যে একটি পিপাসু দীনতা, ক্ষীণতম আশ্বাসের প্রতিদানে নিজেকে আমূল পরিবর্ত্তিত করে ফেলবার একটা অনুচ্চারিত প্রতিজ্ঞা হেরম্ব আজকাল সর্ব্বদা আবিষ্কার করতে পারে। বোঝা যায়, অনাথের প্রতি মালতীর সমস্ত ঔদ্ধত্য অনাথকে আশ্রয় করেই যেন দাঁড়িয়ে থাকে।

নিজের জীবনে সে যে স্থূল অপরিচ্ছন্নতা আমদানী করেছে, অনাথের গায়ে তার নমুনাগুলি লেপন করে দেবার চেষ্টার মধ্যে যেন তার একটি প্রার্থনার আর্ত্তনাদ গোপন হয়ে থাকে, আমাকে শুদ্ধ কর, পবিত্র কর। অনাথের নিরুপদ্রব নির্ব্বিকার ভাব মাঝে মাঝে হেরম্বকেও বিচলিত করে দেয়। সময় সময় তার মনে হয়, এও বুঝি এক ধরণের অসুখ। জ্বর যেমন উত্তাপ বেড়েও হয়, কমেও হয়, এরা দু'জনে তেমনি একই মানসিক বিকারের শান্ত ও অশান্ত অবস্থা দুটি ভাগ করে নিয়েছে।

কখনো কখনো এমন কথাও হেরম্বের মনে হয় যে অনাথের চেয়ে মালতীরই বুঝি ধৈর্য্য বেশী, তিতীক্ষা কঠোরতর, অনাথের আধ্যাত্মিক তপস্যার চেয়ে মালতীর তপস্যাই বেশী বিরাম-বিহীন। অনাথের বিষয়ান্তরের আশ্রয় আছে, অন্যমনস্কতা আছে, যৌগিক বিশ্রাম আছে,—মালতীর জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গতি নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে একনিষ্ঠ। অনাথকে কেন্দ্র করে সে পাক খাচ্ছে। অনাথ তার জগৎ, অনাথ তার জীবন, অনাথকে নিয়ে তার রাগ দুঃখ হিংসা ক্লেশ, অনাথ তার অমার্জ্জিত পার্থিবতার প্রস্রবণ, তার মদের নেশার প্রেরণা। অনাথকে বাদ দিলে তার কিছুই থাকে না।

হেরম্বকে চোখ ঠেরে মালতী গম্ভীর মুখে অনাথকে বলল, 'কাল এক স্বপন দেখলাম। তুমি আর আমি যেন কোথায় গেছি,—অনেক দূর দেশে। পোড়া দেশে আমরা দু'জন ছাড়া আর মানুষ নেই, রাস্তায়-ঘাটে, ঘরে-বাড়ীতে সব মরে রয়েছে।'

অনাথ বলল, 'ভুলেও তো সৎ চিন্তা করবে না। তাই এরকম হিংসার ছবি ত্যাখো।'

মালতী এ কথা কানেও তুলল না, বলে চলল, 'স্বপন দেখে মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে বাপু, যাই বল। আচ্ছা, চল না আমরা দু'জনে একটু বেড়িয়ে আসি ক'দিন? ওদের কণ্ঠি-বদলটা চুকিয়ে দিয়ে যাই, ওরা এখানে থাক। তুমি আমি বিন্দাবনে গিয়ে ঘর বাঁধি চল।'

মালতীর গাম্ভীর্য্যকে বিশ্বাস করে উপদেশ দেবার ভঙ্গিতে অনাথ বলল, 'এখনো তোমার ঘর বাঁধবার সখ আছে, মালতী? বনে যদি যাও তো চল।'

মালতী তার আকস্মিক বিপুল হাসিতে অনাথের ক্ষণিকের অন্তরঙ্গতা চূর্ণ করে দিল। বলল, 'কেন, বনে যাবার এমন কি বয়েসটা আমার হয়েছে শুনি? রাধাবিনোদ গোঁসাই কণ্ঠি-বদলের জন্য সেদিনও আমায় সেধে গেল না? মেয়ে টের পাবে বলে অপমান করে তাড়িয়ে দিলাম, ডাকলেই আবার আসে। তোমার চোখ নেই তাই আমাকে বুড়ী ছাখো! না কি বল, হেরম্ব? আমি বুড়ী?'

হেরম্বকে সে আবার চোখ ঠারল, 'রাধাবিনোদ গোঁসাইকে জান হেরম্ব? মাঝে মাঝে আমায় দেখতে আর সাধতে আসে—লক্ষ্মীছাড়া ব্যাটা। চেহারা যেমন হোক, পয়সা আছে। সেবাদাসীর খাতিরও জানে বেশ—সৌখীন বৈরিগি কিনা। তোমাদের এই মাষ্টারমশায়ের মত কাঠখোট্টা নয়।'

অনাথ বলল, 'কি সব বলছ, মালতী?'

মালতী হঠাৎ ঢোঁক গিলে এদিক-ওদিক তাকায়। দৃষ্টি দিয়ে অনাথকে গ্রাস করতে তার এই দ্বিধা দেখে হেরম্ব অবাক হয়ে যায়। কিন্তু মালতী নিজেকে চোখের পলকে বদলে ফেলে। ঔদ্ধত্যের সীমা

তার কোন দিনই নেই। সে হেসে বলে, 'বৈরিগি মানুষের অত লজ্জা কেন? বলি না হেরম্বকে কাণ্ডটা।—শোন হেরম্ব, বলি। এই যে গোবেচারী ভাল মানুষটিকে দেখছ, সাত চড়ে মুখে রা নেই, আমার জন্যে একদিন এ রাধাবিনোদ গোঁসাই-এর সঙ্গে মারামারি করেছে। হাতা-হাতি চুলোচুলি সে কি কাণ্ড হেরম্ব, দেখলে তোমার গায়ে কাঁটা দিত। আমি না সামলালে সেদিন গোঁসাই খুন হয়ে যেত হেরম্ব। আর আজকে আমি মরি বাঁচি গ্রাহ্যি নেই!'

হেরম্ব বুঝতে পারে, কথার আড়ালে মালতী পুষ্পাঞ্জলির মত অনাথের পায়ে নিবেদন বর্ষণ করছে—যেদিন ছিল সেদিন আবার ফিরে আসুক।

'হ্যাঁ গো, চল না আমরা যাই? মেয়ের মুখ চেয়ে আর কতকাল আমায় কষ্ট দেবে?'

'তোমার সঙ্গে কথা কইলেই তুমি বড় বাজে বক, মালতী।'

বলে অনাথ উঠে গেল। মালতী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'আমার সঙ্গে এমন করলে ভাল হবে না বলছি। বস এসে, আমার আরও কথা আছে, ঢের কথা আছে।'

অনাথ চলে গেলে মালতী ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তার ঠোঁটের বাঁকা হাসিতে নিরুৎসাহ ও নিরুৎসব ভাব চাপা পড়ে গেল। এইমাত্র যে ছিল ভিখারিণী, সে হঠাৎ ক্ষমাদাত্রী হয়ে বলল, 'লোকটা পাগল হেরম্ব, খ্যাপা। আর ছেলেমানুষ।'

'আমি কিছু বলব, মালতী-বৌদি?'

'চুপ্! একটি কথা নয়!'—মালতী টেনে টেনে হাসল, 'তুমি বোঝ ছাই, বলবেও ছাই। দেড় যুগ আঙ্গুল দিয়ে ছোঁয় না, তাই বলে আমি কি

মরে আছি ? বুড়ো হয়ে গেলাম, সখ-টখ আমার আর নেই বাপু, এখন ধম্মোকম্মো সার। ঠাট্টা-তামাসা করি একটু, মিন্‌সে তাও বোঝে না।'

স্নান করে এসে চাবি নিয়ে আনন্দ মন্দিরে গেল। মালতী ঘরে ঢুকে এই ভোরে বাসিমুখে গিলে এল খানিকটা কারণ। মালতী প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণবী, কিন্তু সব দিক দিয়ে অনাথের বিরুদ্ধাচরণ করার জন্য মালতী তান্ত্রিক গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছে। মন্ত্র নিয়ে ধ্যান-ধারণা সমস্ত পর্য্যবসিত করেছে কারণ-পানে। হেরম্বর প্রায় সহ্য হয়ে এসেছিল, তবু ঘুম থেকে উঠেই মালতীর মদ খাওয়া তার বরদাস্ত হল না। সে বাইরে চলে গেল।

মন্দিরের দরজায় দাঁড়িয়ে বলল, 'তোমাকে হয়ত আজ ভক্তদের ব্যবস্থাও করতে হবে, না আনন্দ ?'

আনন্দ চন্দন ঘষছিল। কাজে আজ তার উৎসাহ নেই।

'না, মা আসবে।'

'তিনি এইমাত্র খালি পেটে কারণ খেলেন। চোখ লাল হতে আরম্ভ করেছে।'

'কারণ খেলে মা'র কিছু হয় না।'

হেরম্ব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ আনন্দের অন্যমনস্ক কাজ করা চেয়ে দেখল। হাত পা নাড়তে আনন্দের যেন বড় কষ্ট হচ্ছে। যেমন তেমন করে পূজার আয়োজন শেষ করে দিতে পারলে সে যেন আজ বাঁচে। তিন দিন আগে বর্ষা নেমেছিল। সেদিন থেকে আনন্দের কি যে হয়েছে কেউ জানে না, হয়ত আনন্দ নিজেও নয়। অল্পে অল্পে সে গম্ভীর ও বিবন্ন হয়ে গিয়েছে। তার মধ্যে যে আবেগময় উদগ্রীব উল্লাস আপনা

হতে উৎসারিত হতে পথ পেত না, হেরম্বের ডাকেও আজ তা সাড়া দিতে চায় না। সে ঝিমিয়ে পড়েছে, হেরম্বের কাছ থেকে গিয়েছে সরে। দূরে নয়, অন্তরালে। সেদিনের মেঘ-মেদুর আকাশের মত কোথা থেকে সে একটি সজল বিষণ্ণ আবরণ সংগ্রহ করেছে, ভালবাসার পাখায় ভর করে হেরম্বের মন ঊর্দ্ধে, বহু ঊর্দ্ধে উঠেও অবারিত নীল আকাশকে খুঁজে পাচ্ছে না।

এতদিন হেরম্ব কিছু জিজ্ঞাসা করেনি। আজ সে প্রশ্ন করল, 'তোমার কি হয়েছে, আনন্দ?'

'আমার অসুখ করেছে।'

হেরম্ব হতবাক হয়ে গেল। তার প্রশ্নের জবাবে এই যদি আনন্দের বক্তব্য হয়, তার ভালবাসাকে শুধু এই কৈফিয়ৎ যদি আনন্দ দিতে চায়, তবে আর কিছু তার জিজ্ঞাস্য নেই। সে কি জানে না আনন্দের অসুখ করে নি!

গুরুতর পরিশ্রমের কাজে মানুষ যে ভাবে ক্ষণিকের বিরাম নেয়, চন্দন ঘষা বন্ধ করে আনন্দ তেমনি শিথিল অবসন্ন ভাবে মন্দিরের মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসল। বলল, 'মাথাটা ঘুরছে, বুক ধড়ফড় করছে—'

নিষ্ক্রিয় অবসাদে হেরম্ব মাথা নেড়েও সায় দিল না।

'—আর মন কেমন করছে। চন্দনটা ঘষে দেবে?'

আনন্দের বিষণ্ণতার সমগ্র ইতিহাস এইটুকু। হয়ত এর বিশদ ব্যাখ্যা ছিল; কিন্তু আজও, এক পূর্ণিমা থেকে আরেক অমাবস্যা পর্য্যন্ত আনন্দের হৃদয়ে অতিথি হয়ে বাস করার পরেও, বিশ্লেষণে যা ধরা পড়ে না, শুধু অনুমান দিয়ে আবিষ্কার করে তাকে গ্রহণ করার শক্তি হেরম্বের

জন্মায় নি। আনন্দের মুখ দেখে হেরম্ব ছাড়া আর সকলের সন্দেহ হবার সম্ভাবনা আছে যে আনন্দের দাঁত কন্ কন্ করছে।

'চন্দনটা তুমিই ঘষে নাও, আনন্দ'—বলে হেরম্ব মন্দির ছেড়ে চলে এল। বহুদিন আগে একবার এক বর্ষণ-ক্ষান্ত নিশীথ স্তব্ধতায় সজল বায়ুস্তর ভেদ করে হেরম্বের কলকাতার বাড়ীতে বিনামেঘে বজ্রাঘাত হয়েছিল। স্ত্রীর ভয় তারও মনে সংক্রমিত হওয়াতে বাকী রাতটা হেরম্ব আতঙ্কে ঘুমাতে পারে নি। আজ কিছুক্ষণের জন্য তার অবিকল সেই রকম ভয় করতে লাগল।

ঘরে গিয়ে হেরম্ব বিছানায় আশ্রয় নিল। বারান্দা দিয়ে যাবার সময় দেখে গেল, অনাথ তার ঘরে ধ্যানস্থ হয়েছে। তার নিস্পন্দ দেহের দিকে এক নজর তাকালেই বোঝা যায়, বাহ্যজ্ঞান নেই। অনাথের সুদীর্ঘ সাধনা হেরম্ব দেখে নি, এত দ্রুত তাকে সমাধিস্থ হতে দেখে তার বিস্ময়ের সীমা থাকে না। আনন্দের কাছে সে শুনেছে, গত বৎসরও অনাথের এ ক্ষমতা ছিল না। মাস চারেক আগে অনাথ একবার মাথার যন্ত্রণায় ক'দিন পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল, তারপর থেকে আসনে বসলেই সে সমাধি পায়।

জীবনে মৃত্যুর স্বাদ ভোগ করবার সখ হেরম্বের কোন দিন ছিল না, এ বিষয়ে কৌতূহলও তার নেই। বিছানায় চিৎ হয়ে সে ঘুমেরই তপস্যা আরম্ভ করল। আনন্দ যখন ঘরে এল ঘুমের আশা সে ত্যাগ করেছে, কিন্তু চোখ মেলে নি।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'ঘুমিয়েছ ?'

'না।'

'চন্দন ঘষে দিলে না যে ?'

হেরম্ব উঠে বসল। বলল, 'ওসব আমি পারি না। আমাদের সংসার হলে তুমি যে বলবে এটা কর ওটা কর তা চলবে না আনন্দ। আলসেমিকে আমি প্রায় তোমার সমান ভালবাসি।'

'ভালবাস নাকি আমাকে ?'

আনন্দের কণ্ঠস্বর হেরম্বকে চমকে দিল।

সহজ ও সরল প্রশ্ন নয়। উচ্চারণের পর মরে যায় না এমন সব কথা আনন্দ আজকাল এমনি অবহেলার সঙ্গে বলে। হেরম্বের মনশ্চক্ষে যে ছানি পড়তে আরম্ভ করেছিল চোখের পলকে তা স্বচ্ছ হয়ে গেল। আনন্দের মুখ দেখে সে বুঝতে পারল শুধু বিষণ্ণতা নয়, সেই প্রথম রাত্রিতে চন্দ্রকলা-নাচ শেষ করার পর আনন্দের যে যন্ত্রণা হয়েছিল তেমনি একটি কষ্ট সে জোর করে চেপে রাখছে। হেরম্ব সভয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'একথা বলছ কেন, আনন্দ ?'

'আমার ক'দিন থেকে এ রকম মনে হচ্ছে যে !'

'আগে বল নি কেন ?'

'মনে এলেই বুঝি সব কথা বলা যায় ? আগে বলি নি, এখন তো বলছি। তুমি বলেছিলে ভালবাসা বেশীদিন বাঁচে না। আমাদের ভালবাসা কি মরে যাচ্ছে ?'

হেরম্ব জোর দিয়ে বলল, 'তা যাচ্ছে না আনন্দ। আমাদের ভালবাসা কি বেশী দিনের যে মরে যাবে ? এখনো যে ভাল করে আরম্ভই হয় নি !'

আনন্দ হতাশার সুরে বলল, 'আমি কিছুই বুঝতে পারি না। সব হেঁয়ালির মত লাগে। তুমি, আমি, আমাদের ভালবাসা, সব মিথ্যে মনে

হয়। আচ্ছা, আমাদের ভালবাসাকে অনেকদিন, খুব অনেকদিন বাঁচিয়ে রাখা যায় না?'

হেরম্ব একবার ভাবল মিথ্যা বলে আনন্দকে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু সত্য মিথ্যা কোন সান্ত্বনাই আত্মোপলব্ধির রূপান্তর দিতে পারে না হেরম্ব তা জানে। সে স্বীকার করে বলল, 'তা যায় না আনন্দ, কিন্তু সেজন্য তুমি বিচলিত হচ্ছ কেন? বেশীদিন নাইবা বাঁচল, যতদিন বাঁচবে তাতেই আমাদের ভালবাসা ধন্য হয়ে যাবে। ভালবাসা মরে গেলে আমাদের যে অবস্থা হবে এখন তুমি তা যত ভয়ানক মনে করছ, তখন সে রকম মনে হবে না। ভালবাসা মরে কখন? যখন ভালবাসার শক্তি থাকে না। যে ভালবাসতে পারে না প্রেম না থাকলে তার কি এসে যায়?'

আনন্দ বিস্মিত হয়ে বলল, 'একি বলছ? যা নেই তার অভাববোধ থাকবে না?'

'থাকবে, কিন্তু সেটা খুব কষ্টকর হবে না। আমাদের মন তখন বদলে যাবে।'

'যাবেই? কিছুতে ঠেকানো যাবে না?'

সোজাসুজি জবাব হেরম্ব দিল না। হঠাৎ উপদেষ্টার আসন নিয়ে বলল, 'এসব কথা নিয়ে মন খারাপ করো না আনন্দ। বেশীদিন বাঁচলে কি প্রেমের দাম থাকত? তোমার ফুলগাছে ফুল ফুটে ঝরে যায়, তুমি সেজন্য শোক কর নাকি?'

'ফুল যে রোজ ফোটে।'

কিছুক্ষণের জন্য হেরম্ব বিপন্ন হয়ে রইল। তার মনে হল, আনন্দের

কথায় একেবারে চরম সত্যটি রূপ নিয়েছে, এখন সে যাই বলুক সে শুধু তর্কের খাতিরে বলা হবে, তার কোন মানে থাকবে না। ক'দিন থেকে প্রয়োজনীয় নিদ্রার অভাবে হেরম্বের মস্তিষ্ক অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, জোর করে ভাবতে গিয়ে তার চিন্তাগুলি যেন জড়িয়ে যেতে লাগল। অথচ সত্যকে চিরদিন বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করে এসে আনন্দের উপমা-নিহিত অন্তিম সত্যকে কোন রকমে মানতে পারছে না দেখে তার আশা হল, বংশহীন ফুলের মত একবার মাত্র বিকাশ লাভ করে ঝরে যাওয়ার ব্যর্থতাই মানব-হৃদয়ের চরম পরিচয় নয়, বিকাশের পুনরাবৃত্তি হয়ত আছে, হৃদয়ের পুনর্জ্জন্ম হয়ত অবিরাম ঘটে চলেছে। মানুষের মৃত্যু-কবলিত জীবন যেমন সার্থক, তেমনি সার্থকতা ক্ষণজীবী হৃদয়েরও হয়ত আছে।

হেরম্ব যতক্ষণ ব্যাকুল হয়ে চারিদিক অন্ধের মত হাতড়ে খুঁজে বেড়াতে লাগল এই সার্থকতার স্বরূপ তার কাছে ধরা পড়ল না। হেরম্বের নিদ্রাতুর মনও বেশীক্ষণ খেইহারা চিন্তার অর্থহীন বিড়ম্বনা ভোগ করবার মত নয়। ক্রমে ক্রমে সে শান্ত হয়ে এলে এত সহজে হৃদয়ের মৃত্যু-রহস্য তার কাছে স্বচ্ছ হয়ে গেল যে, এই সুলভ জ্ঞানের জন্য ছেলেমানুষের মত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল বলে নিজের কাছেই সে লজ্জা পেল।

সে প্রীতিকর প্রসন্ন হাসি হেসে বলল, 'মানুষও রোজ ভালবাসে, আনন্দ। প্রত্যেকটি ঝরে-যাওয়া ভালবাসার জায়গায় আবার তেমনি একটি করে ভালবাসা জন্মায়। আমরা মানুষ, গাছ-পাথরের মত সীমাবদ্ধ নই। আমাদের চেতনা সমস্ত বিশ্বে ছড়িয়ে আছে, পৃথিবীর সমস্ত মানুষের

সঙ্গে এক হয়ে আমরা বেঁচে আছি। আমি যেমন সমস্ত মানুষের প্রতিনিধি, সমস্ত মানুষ তেমনি আমার প্রতিনিধি। একটা প্রকাণ্ড হৃদয় থেকে একটুকরো ভাগ করে নিয়ে আমার স্বতন্ত্র হৃদয় হয়েছে, কিন্তু নাড়ী কাটার পরেও মা আর ছেলের যেমন নাড়ীর যোগ থাকে, সমস্ত মানুষের সমবেত অখণ্ড হৃদয়ের সঙ্গে আমারও তেমনি আত্মীয়তা আছে। তুমি ভাবছ এ শুধু কল্পনার বাহার। তা নয় আনন্দ। আকাশ আর বাতাস থেকে আমার মন, আমার হৃদয় নিজেকে সংগ্রহ ও সঞ্চয় করে নি, তাদের প্রতেকটি কণা এসেছে মানুষের ভাণ্ডার থেকে। আমরা জন্মাই একটা বিপুল শূন্য, আজীবন মানুষের সাধারণ হৃদয়-মনের সম্পত্তি থেকে তিল তিল করে ঐশ্বর্য্য নিয়ে সেই শূন্য পূরণ করি। আমরা তাই পরস্পর আত্মীয়, আমরা তাই প্রত্যেকে সমস্ত মানুষের মধ্যে নিজেদের অনুভব করতে পারি। তাই আমাদের ভালবাসা যখন মরে যাবে, অন্য মানুষ তখন ভালবাসবে। আমাদের প্রেম ব্যর্থ হবে না।'

আনন্দ মুহ্যমানার মত তাকিয়ে ছিল। বলল, 'যাবে না?'

'কেন যাবে? আমরা তো একদিন মরে যাব। আমরা যদি মানুষ না হতাম, যদি নিজেদের গণ্ডীর মধ্যেই প্রত্যেকে নিজেদের জেল দিতাম, তাহলে ভাবতাম, মরে যাব বলে আমাদের জীবন নিরর্থক। কিন্তু যে চেতনা থাকার জন্য আমরা পশুর মত জীবনের কথা না ভেবে বাঁচি না, মরণের কথা না ভেবে মরি না, সেই চেতনাই আমাদের বলে দেয় যে মানুষ মরে, মানবতার মৃত্যু নেই। মানুষের জীবন নিয়ে মানবতার অখণ্ড প্রবাহ চলে বলে জীবনও ব্যর্থ নয়। তেমনি—'

'চুপ কর।' হেরম্বকে তীব্র ধমক দিয়ে আনন্দ কেঁদে ফেলল।

ধমকের চেয়ে আনন্দের কান্না আরও তীব্র তিরস্কারের মত হেরম্বকে আঘাত করল। আনন্দ তো কবি নয়।

মেয়েরা কখন কবি হয় না। পৌরুষ ও কবিত্ব একধর্ম্মী। নিখিল মানবতার মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে স্তব্ধ হৃদয়ের একদা-রণিত ধ্বনির প্রতিধ্বনিকে সে কখনও খুঁজে বেড়াতে পারবে না। জগতে তার দ্বিতীয় প্রতিরূপ নেই, সে বৃহতের অংশ নয়; সে সম্পূর্ণ এবং ক্ষুদ্র। যে বংশপ্রবাহ মানবতার রূপ, সে তা বোঝে না। অতীত ভবিষ্যতের ভারে তার জীবন পীড়িত নয়, সার্থকও নয়। সৃষ্টির অনন্ত সূত্রে সে গ্রন্থির মত বিগত ও অনাগতকে নিজের জোরে যুক্ত করে রাখে না। পৃথিবী যেমন মানুষের জড় দেহকে দাঁড়াবার নির্ভর দেয়, মানুষের জীবনকে এরা তেমনি আশ্রয় যোগায়। পৃথিবী জুড়ে হেরম্বের আত্মীয় থাক, আনন্দের কেউ নেই। সে একা।

অনেকক্ষণ কারো মুখে কথা ছিল না। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রথম কথা বলার সাহস কার হত বলা যায় না। এমন সময় হঠাৎ মালতীর তীব্র আর্ত্তনাদ শোনা গেল।

হেরম্ব চমকে বলল, 'ওকি ?'

'মা বুঝি ডাকল।'

বারান্দায় গিয়ে হেরম্ব বুঝতে পারল, ব্যাপার যাই ঘটে থাক অনাথের ঘরে ঘটেছে। ঘরে ঢুকে সে দেখল, অনাথ অজ্ঞান হয়ে

আসনে লুটিয়ে পড়ে আছে, মৃদু ও দ্রুত নিশ্বাস পড়ছে, অতিরিক্ত রক্তের চাপে মুখ অসুস্থ, রাঙা। মালতী পাগলের মত সেই মুখে করে চলেছে চুম্বনবৃষ্টি !

তাকে ঠেলা দিয়ে হেরম্ব বলল, 'শান্ত হন, সরে বসুন, কি হল দেখতে দিন।'

'ও মরে গেছে হেরম্ব, আমি ওকে মেরে ফেলেছি।'

হেরম্বের চিকিৎসা চলল আধ ঘণ্টা। তিন কলসী জল খরচ হল, মালতীর আউন্সখানেক কারণও কাজে লাগল। তারপর অনাথ চোখ মেলে চাইল।

'আঃ, কি কর মালতী ?' বলে আরও খানিকটা সচেতন হয়ে অনাথ বিস্মিত দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাতে লাগল।

হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছিল ?'

মালতী কপাল চাপড়ে বলল, 'আমার যেমন পোড়া কপাল! জন্মদিন বলে একটা প্রণাম করতে গিয়েছিলাম, কে জানে তাতেই ভড়কে গিয়ে ভিরমি খাবে !'

অনাথের স্বাভাবিক মৃদুকণ্ঠ আরও ঝিমিয়ে গেছে। সে বলল, 'আসনে বসলে আমাকে ছুঁতে তোমায় কতবার বারণ করেছি, মালতী। কঠিন যোগাভ্যাস করছি, হঠাৎ অপবিত্র স্পর্শ পেলে—'

মালতী ইতিমধ্যেই খানিকটা সামলেছে।

'কিসের অপবিত্র স্পর্শ ? চান করে আসিনি আমি ? এমনি বিদ্ঘুটে স্বভাব জানি বলেই না পুকুরে ডুব দিয়ে এলাম !'

'পুকুরে ডুব দিয়ে এলেই মানুষ যদি পবিত্র হত—'

'আমার পোড়া কপাল তাই মরণ নেই!'

অনাথ হাল ছেড়ে দিয়ে বলল, 'তুমি বুঝতে পার না মালতী। পবিত্র অপবিত্র স্পর্শের জন্য শুধু নয়, আসনে আমি যেরকম অবস্থায় থাকি আমাকে ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় আসতে হয়, কোন কারণে হঠাৎ বাহ্যজ্ঞান ফিরলে বিপদ ঘটে। আমি আজ মরেও যেতে পারতাম!'

মালতী কোন সময় হার স্বীকার করে না। বলল, 'এমন আসনে তবে বসা কেন!'

অনাথ বলল, 'সে তুমি বুঝবে না। কিন্তু আজ তো তোমার জন্মদিন নয়?—কাল!'

'আজ তো আগের দিন?—আজ আমার জন্মদিনের পারণ।'

অনাথ আর তর্ক করল না। ঘরের কোণে টাঙ্গানো দড়ি থেকে একখানা শুকনো কাপড় নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেল। মালতী বসে রইল মুহ্যমানা হয়ে। সেও আগাগোড়া ভিজেছে। তাকে কয়েকটা সদুপদেশ দেবার ইচ্ছা হেরম্ব জোর করে চেপে গেল। এত কাণ্ডের পরেও আনন্দ এ ঘরে আসে নি খেয়াল করে সে উস্‌খুস্ করতে লাগল।

'দেখলে, হেরম্ব?'

এ প্রশ্নের জবাব হয় না, মন্তব্য হয়। হেরম্ব সাহস পেল না।

'এমন জানলে কে মিন্‌সেকে ঠাট্টা করতে যেত!'

'এ আপনার ঠাট্টা নাকি, মালতী-বৌদি?'

মালতী রেগে বলল, 'কি তবে? সঙ্কেত্তন? আবোল-তাবোল বোকো না বাবু, মাথায় আগুন জ্বলছে, মন্দ কিছু বলে বসব। কাল আমার

জন্মদিন। জন্মদিনে শ্রীচরণে ঠাঁই পাই। বছরে ওর এই একটা দিন-রাত্তির আমার সঙ্গে সম্পর্ক,—হেসে কথাও কয়, ভালও বাসে।—গা ছুঁয়ে বলছি ভালবাসে, হেরম্ব!' মালতী মুচকে মুচকে হাসে, 'কেন তা জান না বুঝি? শোন বলি। সেই গোড়াতে, মাথাটা যখন পর্য্যন্ত ওর খারাপ হয় নি, তখন পিতিজ্ঞে করিয়ে নিয়েছিলাম, আর যেদিন যা খুসী কর বাপু, কথাটি কইব না, আমার জন্মদিনে সব হুকুম মেনে চলবে। পাগল হলে কি হবে হেরম্ব, পিতিজ্ঞের কথাটি ভোলে নি। মুখ বুজে আজও মেনে চলে।' মালতী বিজয়-গর্ব্বে হাসে, 'বিষ খেতে বললে তাও খায়, হেরম্ব।'

অনাথের এটুকু দুর্ব্বলতা হেরম্ব কল্পনা করতে পারে।

'এবার জন্মদিনে তাই বরং মাষ্টারমশাইকে খেতে দেবেন, মালতী-বৌদি।'

শুনে মালতী আগুন হয়ে হেরম্বকে ঘর থেকে বার করে দেয়।

হেরম্ব আর কোথায় যাবে, প্রথম রাত্রিতে বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাড়ীর পিছনের প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে অদূরবর্ত্তী যে আমবাগান তার চোখে অরণ্যের মত প্রতিভাত হয়েছিল, বানপ্রস্থাবলম্বীর মন নিয়ে হেরম্ব সেইখানে গেল। এখানে আছে ভোরের পাখীর ডাক আর অসংখ্য কীটপতঙ্গের প্রণয়। পচা ডোবার জলে হয়ত আমিবা আত্মপ্রণয়ে নিজেকে বিভক্ত করে ফেলছে, তরু বল্কলের আড়ালে পিপীলিকার চলেছে শুঁড়ে শুঁড়ে প্রণয়ভাষণ, হেরম্বের পায়ের কাছ দিয়ে এক হয়ে এগিয়ে চলেছে কর্ণজলোকা দম্পতী, গাছের ডালে ডালে একজোড়া অচেনা পাখীর লীলাচাঞ্চল্য।

দিবারাত্রির কাব্য

অনেকক্ষণ পরে সে ঘরে ফিরে আসে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে মন্দির-চত্বরে সমবেত ভক্তবৃন্দের মধ্যে সুপ্রিয়াকে আবিষ্কার করতে তার বেশীক্ষণ দেরী হয় না। তখন পূজা ও আরতি শেষ হয়েছে। মালতী বিতরণ করছে মাতুলি। তার কাছে বসে সুপ্রিয়া তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আনন্দের দিকে। হেরম্ব মিলিয়ে দেখল ক'দিনের বর্ষার পর আজ যে ঝাঁঝালো রোদ উঠেছে, সুপ্রিয়ার চোখের আলোর সঙ্গে তার প্রভেদ নেই।

প্রতিজ্ঞা-পালনের জন্য মালতীর জন্মদিনে অনাথ তার সমস্ত হুকুম মেনে চলে, প্রতিজ্ঞা পালনের জন্যই এখানে এসে হেরম্ব সুপ্রিয়াকে একখানা পত্র লিখেছিল। সুপ্রিয়া যে তাকে দিয়ে চিঠি লেখার প্রতিজ্ঞা করিয়ে নিয়েছিল তা নয়, কথা ছিল ঠিকানা জানাবার। চিঠি না লিখে একজনকে ঠিকানা জানানো যায় না বলে হেরম্ব বাধ্য হয়ে একখানা চিঠিই লিখেছিল। ঠিকানা দিয়ে তার দুটি দরকারের কথা সুপ্রিয়া স্বীকার করেছিল। প্রথম, মাঝে মাঝে চিঠি লিখে হেরম্বকে সে তার কথা ভুলতে দেবে না। দ্বিতীয়, হেরম্ব কোথায় আছে জানা না থাকলে তার যে কেবলি মনে হয় সে হারিয়ে গেছে, অসুখে ভুগছে, বিপদে পড়েছে,—এই দুশ্চিন্তাগুলির হাত থেকে সে রেহাই পাবে।

খুসীমত কাছে এসে হাজির হওয়ার একটা তৃতীয় প্রয়োজনও যে

তার থাকতে পারে হেরম্ব আগে তা খেয়াল করে নি। একটা নিশ্বাস ফেলে সে মন্দির-চত্বরে ভক্তদের সভায় গিয়ে বসল।

'কবে এলি, সুপ্রিয়া ?'

সে যেন জানত সুপ্রিয়া পুরীতে আসবে। কবে এসেছে তাই শুধু সে জানে না।

'এসেছি পরশু। আপনি এখানে ক'দিন আছেন ?'

'আজ নিয়ে পনের দিন।'

'দিন গোণার স্বভাব তো আপনার ছিল না ?' বলে সুপ্রিয়া আনন্দের দিকে কুটিল কটাক্ষপাত করল।

হেরম্ব হেসে বলল, 'এমনি অনেকগুলি স্বভাব আমি অর্জ্জন করেছি সুপ্রিয়া, যা আমার ছিল না। আগেই তোকে বলে রাখলাম পরে যেন আর গোল করিসনে।'

মালতী রুক্ষস্বরে বলল, 'বড় গোল হচ্ছে। এদের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা না, আনন্দ ? এটা আড্ডা দেবার বৈঠকখানা নয়।'

সুপ্রিয়া একথায় অপমানিত বোধ করে বলল, 'আমি বরং আজ যাই।'

আনন্দ বলল, 'না না, যাবেন কেন ? ঘরে গিয়ে বসবেন চলুন।'

হেরম্বও আমন্ত্রণ জানিয়ে বলল, 'আয় সুপ্রিয়া।'

অপমান ভুলে সুপ্রিয়া ঘরে গিয়ে বসতে রাজী হল। হেরম্ব জানত রাজী সে হবে। এতক্ষণ মালতী ও আনন্দের সঙ্গে সুকৌশলে আলাপ করে সে কতখানি জ্ঞান সঞ্চয় করেছে হেরম্ব তা জানে না, কিন্তু আনন্দকে দেখার পর এই জ্ঞানলাভের পিপাসা তার অবশ্যই এমন তীব্র

হয়ে উঠেছে যে, আরও ভাল করে সব জানবার ও বুঝবার কোন সুযোগই সহজে আজ সে ত্যাগ করবে না। তার ভাল করে জানা ও বোঝাটা ঠিক কি ধরণের হবে হেরম্ব তাও অনুমান করতে পারছিল। অনুমান করে তার ভয় হচ্ছিল। ভয়ের কথাই। চোখের সামনে ভবিষ্যৎকে ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যেতে দেখে ভয়ঙ্কর না হয়ে ওঠার মত নিরীহ সুপ্রিয়া এখন আর নেই। মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে গল্প শুনে যে বড় হয়েছিল, বড় হয়ে ছোট ছোট কাজ করে, ছোট ছোট সেবা দিয়ে আর সর্ব্বদা কথা শুনে চলে যে ভালবাসা জানাবার চেষ্টা করেছিল, আজ হেরম্বের সাধ্য নেই তাকে সামলে চলে। অথচ, আজকের এই সঙ্গীন প্রভাতটিতে সে আর আনন্দ দু'জনকেই সামলে চলার দায়িত্ব পড়েছে তার উপরে। জীবন-সমুদ্রে তাকে লক্ষ্য করে দু'টি বেগবতী অর্ণবপোত ছুটে আসছে, সে সরে দাঁড়ালে তাদের সংঘর্ষ অনিবার্য্য, সরে না দাঁড়ালে তার যে অবস্থা হওয়া সম্ভব তাও একেবারেই লোভনীয় নয়। আজ পর্য্যন্ত হেরম্বের জীবনে অনেকবার অনেকগুলি সকাল ও সন্ধ্যায় কাব্যের অন্তর্দ্ধান ঘটেছে। আজ সকালে কাব্যলক্ষ্মী শুধু যে পালিয়ে গেলেন তা নয়, তার সিংহাসন যে-হৃদয় সেখানে প্রচুর অনর্থ ও রক্তপাতের সম্ভাবনাও ঘনিয়ে এল। অনাথের একটি কথা তার বারংবার মনে পড়তে লাগল : মানুষ যে একা পৃথিবীতে বাঁচতে আসে নি সব সময় তা যদি মানুষের খেয়াল থাকত!

তাদের দু'জনকে হেরম্বের ঘরে পৌঁছে দিয়ে আনন্দ চলে গেল। সুপ্রিয়া ম্লান হেসে বলল, 'মেয়েটার বুদ্ধি আছে তো!'

হেরম্ব অন্যমনস্ক ছিল। বলল, 'কার বুদ্ধি আছে? ক্ষেপেছিস্!

আমাদের ও বুদ্ধি করে একা রেখে যায় নি। কাজ করতে গিয়েছে। কাজ না থাকলে এখান থেকে ও নড়ত না, বসে বসে তোর সঙ্গে গল্প করত।'

'সত্যি ? তাহলে মেয়েটা খুব সরল। আমি বুঝতে পারি নি।'

'বুঝতে পারিস নি ? তুই কি ওর সঙ্গে পাঁচ মিনিটও কথা বলিস নি, সুপ্রিয়া ?'

সুপ্রিয়ার মুখ লাল হয়ে গেল। সে নীচু গলায় বলল, 'তা বলেছি। আমারি বুদ্ধির দোষ। বুদ্ধি ঠিক থাকলে ওই মেয়েটা যে খুব সরল এটা বুঝতে পাঁচ মিনিট সময়ও লাগত না।'

সুপ্রিয়ার অপলক দৃষ্টিপাতে হেরম্ব একটু লজ্জা বোধ করল। সরলতার হিসাবে সুপ্রিয়াও যে কারো চেয়ে ছোট নয় এও তো সে জানে। সুপ্রিয়ার অভিজ্ঞতা বেশী, মানুষের মনের জটিল প্রক্রিয়া অনুধাবন করার শক্তি বেশী, সে তাই সাবধানে কথা বলে, হিসাব করে কাজ করে। কিন্তু তার কথা ও কাজে সরলতার অভাব কোনদিনই হেরম্বের কাছে ধরা পড়ে নি, মিথ্যার মানস-স্বর্গ ওর নেই। এও হয়ত সত্য যে, আনন্দের সহজাত সরলতার চেয়ে সুপ্রিয়ার মনোভিজাত্যের সরলতা বেশী মূল্যবান। একটা ছেলেমানুষী, আর একটা সুশিক্ষা।

হেরম্ব সুর বদলাল।

'ভাল করে বোস সুপ্রিয়া, তোর কষ্ট হচ্ছে।'

'কষ্ট হওয়া মন্দ কি ? তাতে মানুষের দরদ পাওয়া যায়। চোখে না দেখলে কেউ তো বোঝে না কারো কষ্ট আছে কি নেই !'

'কারো কি নিজের কষ্টের কিছু অভাব আছে সুপ্রিয়া, যে পরের মধ্যে কষ্ট খুঁজে বেড়াবে ?'

'সবাই তো সকলের পর নয়!'

হেরম্ব হেসে বলল, 'নয়? তুই ছাই জানিস্। মোহ-মুদ্গর, বৈরাগ্যশতক, মহানির্ব্বাণ তন্ত্র সব লিখেছে—'

সুপ্রিয়া অত্যন্ত মৃদুস্বরে বলল, 'কাছে এসে বসুন না? দূরে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে লাভ কি?'

'কোথায় বসব দেখিয়ে দে।'

'তাহলে থাকুন দাঁড়িয়ে।'

সুপ্রিয়া জানালার সঙ্কীর্ণ স্থানটিতে অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে বসেছিল। সেখানে তার কাছে বসা অসম্ভব। হেরম্ব বিছানায় বসে তাকে ডাকল, 'আয় সুপ্রিয়া, এখানে এসে বোস। এখুনি এলি, এসেই ঝগড়া জুড়ে দিলি কেন?'

উঠে এসে বিছানায় বসে সুপ্রিয়া বলল, 'আপনিই বা শুধু হাল্কা কথা বলছেন কেন? পুরীতে কেন এলাম জিজ্ঞাসা করবেন কখন?'

'একেবারেই যদি জিজ্ঞাসা না করি?'

'তাহলে একটু মুস্কিলে পড়ব।' সুপ্রিয়া এবার হাসল, 'আপনি এ ঘরে থাকেন, না?'

'হ্যাঁ, একা। আমি এ ঘরে একা থাকি সুপ্রিয়া।'

'তা জানি না নাকি!'

'জানিস্ বৈকি। তবু বললাম। রাগিস্ নে। তোকে তো গোড়াতেই বলেছি, আমার ছিল না এমন অনেক স্বভাব ইতিমধ্যে আমি অর্জ্জন করে ফেলেছি। বাহুল্য কথা বলা তার মধ্যে একটা।'

কথা, কথা, কথা! শুধু কথা পাকানো, কথা মোচড়ানো, কথা

নিয়ে লড়াই করা। সুপ্রিয়া মাথা নত করল। এত কথা কি জন্য? পরিচয়ের জন্য নয়, উদ্দেশ্য নির্ণয়ের জন্য নয়, সময় কাটানোর জন্যও নয়। পরিচয় তাদের যা আছে আর তা বাড়বে না, পরস্পরের উদ্দেশ্য সম্বন্ধেও ভুল হবার তাদের কোন কারণ নেই, কথা না বললেও তাদের সময় কাটবে। তবু প্রাণপণে তারা কথা বলছে। চিরকাল এমনভাবে মানুষ কত কথা বলতে পারে? আজও অনিশ্চয়তা বজায় থাকার অভিমানে সুপ্রিয়া কথা বন্ধ রাখল। হেরম্ব চুপ করল বক্তব্যের অভাবে। একথা মিথ্যা নয় যে, কথা নিয়ে লড়াই করাটাই চরম উদ্দেশ্যে দাঁড়িয়ে গেছে বলে সুপ্রিয়াকে বলার তার কিছুই নেই।

কাছাকাছি বসে এমনি ভাবে পরের মত তারা চিন্তা করছে, আনন্দ ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কাছে টাকা আছে? দশটা টাকা দিতে পারবে?'

'টাকা কি হবে আনন্দ?'

'বাবা চাইল।'

হেরম্ব অবাক হয়ে গেল। 'মাষ্টারমশাই টাকা চাইলেন? টাকা দিয়ে তিনি কি করবেন?'

আনন্দ এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না। সে জানে না। টাকা নিয়ে সে চলে গেলে হেরম্ব চেয়ে দেখল সুপ্রিয়া খুব সরলভাবে অত্যন্ত কুটিল হাসি হাসছে। আনন্দের সঙ্গে হেরম্বের আর্থিক সম্পর্কটি আবিষ্কার করা মাত্র তার যেন আর কিছু বুঝতে বাকী নেই। এতক্ষণে সে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হল। প্রতিবাদ করতে গিয়ে হেরম্ব চুপ করে গেল। প্রতিবাদ শুধু নিষ্ফল নয়, অশোভন।

সুপ্রিয়া উঠে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, 'বাড়ী পৌঁছে দেবেন না ?'

'এখুনি যাবি ?'

'আর বসে কি হবে ? চলুন, পৌঁছে দেবেন।'

'তুই কি একা এসেছিস নাকি, সুপ্রিয়া ? একা এসে থাকলে একা যাওয়াই তো ভাল।'

'একা কেন আসব ? চাকরকে সঙ্গে এনেছিলাম, আপনি আছেন শুনে তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছি। চলুন, যাই।'

ছলনা নয়, হেরম্ব সত্য সত্যই আলস্য বোধ করে বলল, 'আর একটু বোস না সুপ্রিয়া ?'

সুপ্রিয়া মাথা নেড়ে বলল, 'না, আর একদণ্ডও বসব না। কি [illegible] বসতে বলছেন ?'

হেরম্ব আশ্চর্য্য হয়ে বলল, 'তুই আসতে পারিস, আমি তোকে বসতে বলতে পারি না ? আমার ভদ্রতা-জ্ঞান নেই ?'

সুপ্রিয়া গম্ভীর হয়ে বলল, 'ভদ্রতা-জ্ঞানটা কোন কাজের জ্ঞান নয়। আমি এখানে কেন এসেছি জানা দূরে থাক, পুরীতে কেন এসেছি ও-জ্ঞান দিয়ে আপনি তাও অনুমান করতে পারবেন না। না যদি যান তো বলুন মুখ ফুটে, এখানে আমার গা কেমন করছে, আমি ছুটে পালিয়ে যাই। পুরী সহরে আপনি আমাকে আজকালের মধ্যে খুঁজে বার করতে পারবেন সে ভরসা আছে।'

হেরম্ব আর কথা না বলে জামা গায়ে দিল। বারান্দা পার হয়ে তারা বাড়ীর বাইরে যাবার সরু প্যাসেজটিতে ঢুকবে, ওঘর থেকে বেরিয়ে এসে আনন্দ একরকম তাদের পথরোধ করে দাঁড়াল।

'কোথায় যাচ্ছ ?'

হেরম্ব বলল, 'একে বাড়ী পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।'

'খেয়ে যাও।'

সুপ্রিয়া এর জবাব দিল। বলল, 'আমার ওখানে খাবে।'

আনন্দ বলল, 'পেটে খিদে নিয়ে অদ্দূর যাবে? সকালে উঠে খেতে না পেলে ওর মাথা ঘোরে তা জানেন?'

সুপ্রিয়া বলল, 'মাথা না হয় একদিন ঘুরলই।'

হেরম্ব অভিভূত হয়ে লক্ষ্য করল পরস্পরের চোখের দিকে চেয়ে তারা আর চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে না। সুপ্রিয়ার চোখে গভীর বিদ্বেষ, তাই দেখে আনন্দ অবাক হয়ে গেছে। দু'জনের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হেরম্ব সসঙ্কোচে বলল, 'আমার খিদে পায় নি আনন্দ, একটুও পায় নি।'

আনন্দ অভিমান করে বলল, 'পায় নি? তা পাবে কেন? আমি কিছু বুঝিনে কিনা!'

হেরম্ব তখন নিরুপায় হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এবার কি কর্ত্তব্য, সুপ্রিয়া?'

তাকে মধ্যস্থ মেনে হেরম্ব একরকম স্পষ্টই ইঙ্গিত করল যে, সে যখন বয়সে বড়, আনন্দের কাছে হার স্বীকার করে তারই উদারতা দেখানো উচিত। সুপ্রিয়া রাগ করে বলল, 'আমি জানিনে।'

'এখান থেকেই খেয়ে যাই, কি বলিস?

'তাও আমি জানিনে।'

হেরম্ব নির্ব্বাক হয়ে গেল। আনন্দ একটু হেসে বলল, 'আচ্ছা,'

আপনি যে এত জোর খাটাচ্ছেন, আপনার কি জোর আছে বলুন তো! ও আমাদের অতিথি, আপনার তো নয়!'

'আমি ওর বন্ধু।'

আনন্দ আরও ব্যাপকভাবে হেসে বলল, 'আমিও তো তাই!'

হেরম্ব কখনও কোন কারণে সুপ্রিয়ার মুখে হিংস্র-ব্যঙ্গ শোনে নি, আজ শুনল। হঠাৎ মুচকে হেসে সুপ্রিয়া বলল, 'তুমি?'—বলে, এই একটিমাত্র শব্দে আনন্দকে একেবারে উড়িয়ে দিয়ে ক্ষণিকের বিরাম নিয়ে সে যোগ দিল, 'ওর সঙ্গে আমার যেদিন থেকে বন্ধুত্ব, তোমার তখন জন্মও হয় নি!'

আনন্দ আশ্চর্য্য হয়ে বলল, 'যান্! আমার জন্মের সময় আপনার আর কত বয়স ছিল?—কত আর বড় হবেন আপনি আমার চেয়ে? আপনার বয়স উনিশ কুড়ির বেশী কখ্খনো নয়।'

সুপ্রিয়া বুঝতে পারল না, হেরম্বই শুধু টের পেল আনন্দের এ প্রশ্ন কৃত্রিম নয় সে পরিহাস করে নি। সুপ্রিয়ার মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। সে যেন হঠাৎ ধমক দিয়ে বলল, 'তুমি ছেলেমানুষ তাই তোমাকে কিছু বললাম না। বয়সে যারা বড় আর কখনো তাদের সঙ্গে এ রকম ঠাট্টা কোর না।'

সুপ্রিয়ার ধমকে মুখ ম্লান করে আনন্দ যা বলেছিল তার কোন মানে নেই,—শুধু একটি 'আচ্ছা'। হেরম্ব ভাল করেই জানে সুপ্রিয়ার কাছে সে যে অপমান পেয়েছে তার জন্য আনন্দ তাকেই দায়ী করবে। দায়ী

করে সে হয়ে থাকবে বিষণ্ণ। আনন্দের বর্ত্তমান মানসিক অবস্থায় সহজে এর প্রতিকারও করা যাবে না।

গাড়ীতে সুপ্রিয়ার সামনের আসনে বসে আনন্দের কথা ভাবা চলছিল। সে উঠে পাশে এসে বসায় হেরম্বের আর সে ক্ষমতা রইল না।

'পাশে বসাই নিয়ম, না?'

হেরম্ব একটু ভেবে বলল, 'অন্ততঃ অনিয়ম নয়।'

সুপ্রিয়া হেসে বলল, 'আসল কথা, কথা বলব। কে একটা লোক পিছনে উঠে বসেছে, শুনতে পাবে বলে সামনে এগিয়ে এলাম।'

'তোর প্রগতির অর্থ খুব গভীর সুপ্রিয়া।'

সুপ্রিয়া একটু অসন্তুষ্ট হয়ে বলল, 'আপনার এই যে কথা বলার ঢং মন্ত্রদাতা গুরুর মত, চিরকাল এই সুর শুনে আসছি। হাল্কা কথা বলেন, তাও উপদেশের মত ভারি আওয়াজে।'

'একটা কথা ভাবতে ভাবতে অন্য কথার জবাব অমনি করেই দিতে হয়।'

'ও, আচ্ছা ভাবুন। আমি চুপ করলাম।'

বাড়ীর দরজায় গাড়ী থামা পর্য্যন্ত সুপ্রিয়া সত্যই চুপ করে রইল। যেখানে তারা বাড়ী নিয়েছে সেখান থেকে সমুদ্রের আওয়াজ শোনা যায় বটে, বাড়ীর ছাদে না উঠলে সমুদ্র দেখা যায় না। এবারও সুপ্রিয়া হেরম্বকে বাড়ীর বাজে অংশ পার করিয়ে একেবারে তার শোবার ঘরে নিয়ে হাজির করল। হেরম্ব লক্ষ্য করল, ঘরখানা দোকানের মত সাজানো নয়, শয়ন-ঘরের মতও নয়। বিদেশ বলে বোধ হয় ঘরে আসবাব বেশী নেই, অস্থায়ী বলে সুপ্রিয়ার নেই ঘর সাজাবার উৎসাহ।

উৎসাহের অভাব ছাড়া অন্য কারণও হয়ত আছে। এটা যদি সুপ্রিয়ারই শয়ন-কক্ষ হয় তবে সে এখানে একাই থাকে। ছোট চৌকিতে যে বিছানা পাতা আছে সেটা একজনের পক্ষেও ছোট। অশোক যদিও এখন বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে আছে, এ অধিকার হয়ত তার সাময়িক, হয়তো এ তার নিছক গায়ের জোর। এই সব পলক-নিহিত অনুমানের মধ্যেও হেরম্ব কিন্তু টের পাচ্ছিল অশোকের গায়ের জোর বড় আর নেই। সে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের মত শীর্ণ হয়ে গেছে।

অশোক উঠল না। বলল, 'হেরম্ববাবু যে!'

হেরম্ব বলল, 'আমিই। তোমাকে চেনা যাচ্ছে না, অশোক!'

'যাবেও না। মরে ভৌতিক অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছি যে! এ যা দেখছেন, এ হল সূক্ষ্ম শরীর।'

'সূক্ষ্ম সন্দেহ নেই।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনার পত্রে জানা গেল এখানকার জল-হাওয়া ভাল। উনি মনে করলেন, আমার অবস্থা বুঝে পুরীতে আমাদের নেমন্তন্নই বুঝি করছেন ওই কথা লিখে। তাই জোর করে টেনে এনেছেন। ছুটীর জন্য বেশী লেখালেখি করতে গিয়ে চাকরীটি প্রায় গিয়েছিল মশায়।'

আনন্দের সঙ্গে কথা বলার সময় সুপ্রিয়ার কণ্ঠস্বরে যে ব্যঙ্গ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, অশোকের কথায় যেন তারই ভদ্র, গোপন-করা ধ্বনি শোনা যায়। হেরম্ব একটু সাবধান হল।

'তোমার আঙ্গুল কি হল, অশোক?'

অশোকের ডান হাতের মাঝের আঙ্গুল দু'টি কাটা। ঘা শুকিয়ে এসেছে কিন্তু আরক্তভাব এখনো যায় নি, শুকনো ঘায়ের মামড়ি তুলে

ফেললে যেমন দেখায়। এ বিষয়ে অশোকের নিজের কৌতূহল বোধ হয় এখনো যায় নি, হাতটা চোখের সামনে ধরে সে কাটা আঙ্গুলের গোড়া দু'টি পরীক্ষা করে নিল। বলল, 'একজন ছোরা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে।'

'ছোরা, অশোক ?'

'উঁহুঁ, দেশী দা, ভয়ানক ধার। আট্‌কাতে গিয়ে আঙ্গুল দুটো উড়ে গেছে। উড়ে যাওয়া উচিত ছিল মাথাটার, কেন যে গেল না ভাবলে মাথাটা আজও গরম হয়ে ওঠে!'

সুপ্রিয়া বলল, 'মাথা গরম করে আর কাজ নেই। দোষ তো তোমার। থানাভরা সেপাই জমাদার, তবু নিজে ডাকাতের সামনে গলা এগিয়ে দেবে, বিবেচনা তো নেই!'

অশোক নির্ম্মম ভাবে হাসল। বলল, 'বিবেচনা করেই গলা বাড়িয়ে দিতাম, কর্ত্তব্যের খাতিরে। তুমি যা ভেবেছিলে তা একেবারেই সত্য নয়।'

'আমি কিছুই ভাবি নি।'

'ভাব নি? তবে যে ডাকাত ধরতে গেলেই বলতে জেনে-শুনে প্রাণটা দিতে যাচ্ছি নিজের, খুন হতে যাচ্ছি সাধ করে? অমনি করে অমঙ্গল ডেকে আনতে বলেই তো আঙ্গুল দুটো আমার গেল!'

সুপ্রিয়া বিবর্ণ মুখে বলল, 'কি সব বলছ তুমি? চুপ কর।'

হেরম্ব এতক্ষণে ভেতরে ভেতরে রেগে আগুন হয়ে উঠেছে। মানুষকে ব্যঙ্গ করার যে ধারালো ক্ষমতা সে প্রায় পরিত্যাগ করেছিল এবার তাই সে কাজে লাগাল।

'আহা বলুক না সুপ্রিয়া, বলুক। অতিথিকে অশোক এণ্টার্‌টেন্‌ করছে বুঝতে পারিস না? গৃহস্বামীর এই তো প্রথম কর্ত্তব্য। ওর কথা শুনো না অশোক, তোমার যা বলতে ইচ্ছা হয় এমনি রস দিয়ে বল। তোমার কর্ত্তব্য তুমি করবে বৈকি!'

অশোকের স্তিমিত চোখ জ্বল্‌ জ্বল্‌ করে উঠল। হেরম্ব স্পষ্ট দেখল অসুস্থ স্বামীর লাঞ্ছনায় সুপ্রিয়ার মুখও ব্যথায় ম্লান হয়ে গেছে। কিন্তু হেরম্বের মধ্যে যে নিষ্ঠুরতা মরে যাচ্ছিল আজ তা মরণ-কামড় দিতে চায়; গলা নামিয়ে সে যোগ দিল, 'তুমি গৃহস্বামী যে!'

অশোক দেয়ালের দিকে মুখ করে বলল, 'না।—না।'

হেরম্ব শান্তভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'কি না, অশোক?'

'গৃহস্বামী অসুস্থ। তার কোন কর্ত্তব্য নেই।'

হেরম্ব বলল, 'তাহলে তোমায় বিরক্ত করা উচিত হবে না। আমরা অন্য ঘরে যাই।'

হেরম্ব ঘর থেকে বেরিয়ে এল। সুপ্রিয়া তাকে অন্য একটি ঘরে, যে ঘরের মেঝেতে শুধু মাদুর পাতা ছিল, নিয়ে গিয়ে বলল, 'বসুন। ওকে একটু শান্ত করে আসি।'

'পারবি না সুপ্রিয়া, ও একটা আস্ত বাঁদর।'

'গালাগালি কেন?' বলে সুপ্রিয়া চলে গেল।

শুধু একটি মাদুর বিছানো, একটা বালিশ পর্য্যন্ত নেই। মাদুরটা দেয়ালের কাছে সরিয়ে নিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে হেরম্ব আরাম করে বসল। হেরম্বের প্রাণশক্তি অপরিমেয়, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত, চেতনার বাদ-বিসম্বাদ সহ্য করার ক্ষমতা তার অনমনীয়, কিন্তু আজ সে অপরিসীম

শ্রান্তি বোধ করল। দুঃখ বিষাদ বা আত্মগ্লানি নয়, শুধু শ্রান্তি। সুপ্রিয়ার প্রত্যাবর্ত্তনের আগে এই বাড়ী ছেড়ে, আনন্দের সঙ্গে দেখা হবার আগে পুরী থেকে পালিয়ে, চিরদিনের জন্য নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে পেলে সে যেন এখন বেঁচে যায়! হেরম্বের ঘুম আসে,—এক সদয় দেবতার আশীর্ব্বাদের মত। সে চোখ বোজে। একটা ব্যাপার সে বুঝতে পেরেছে। আনন্দের বিষণ্ণ, বিরস প্রহরগুলির জন্ম-ইতিহাস। আর এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, যে কারণে না মরে তার আর পুনর্জ্জন্ম সম্ভব নয়, সেই কারণেই তার ক্ষয়-পাওয়া হৃদয়েরও পুনরুজ্জীবন অসম্ভব হয়ে গেছে। তার জীবনে প্রেম এসেছে অসময়ে। প্রেমের সে অনুপযুক্ত। বসন্ত-সমাগমে অর্দ্ধমৃত তরুর কতগুলি পল্লব কুসুমাস্তীর্ণ হয়ে গেছে বটে, কিন্তু কত শুষ্ক শাখায় জীবন নেই, কত শাখার বল্কল পিপীলিকা-বাস-জীর্ণ। তার অকাল-বার্দ্ধক্যের সঙ্গে আনন্দের অহরহ পরিচয় ঘটে, আনন্দের কত খেলা তার প্রিয় নয়, আনন্দের কত উল্লাস তার কাছে অর্থহীন। আনন্দ তা টের পায়। কত দিক দিয়ে আনন্দ তার সাড়া পায় না, যদি বা পায় তা কৃত্রিম, মন-রাখা সাড়া। আনন্দ বিমর্ষ হয়ে যায়। মনে করে, হেরম্বের প্রেম বুঝি মরে যাচ্ছে। হেরম্বের প্রেমই যে দুর্ব্বল এখনো সে তা টের পায় নি।

সুতরাং আনন্দকেও সে ঠকিয়েছে। জীর্ণাবশিষ্ট যৌবনের সবখানিই প্রায় তাকে ব্যয় করতে হয়েছে আনন্দকে জয় করতে, এখন তাকে দেবার তার কিছু নেই। একথা তার জানা ছিল না যে, পরিপূর্ণ প্রেমের অনন্ত দাবী মেটাবার ক্ষমতা আছে একমাত্র অবিলম্বিত, অনপচয়িত, সুস্থ ও শুদ্ধ যৌবনের। অভিজ্ঞতায় প্রেমের খোরাক নেই, মনস্তত্ত্বে

ব্যুৎপত্তি প্রেমকে টিঁকিয়ে রাখার শক্তি নয়। নারীকে নিয়ে একদিনের জন্যও যে খেয়ালের খেলা খেলেছে, তুচ্ছ সাময়িক খেলা, প্রেমের উপযুক্ততা তার ক্ষুণ্ণ হয়ে গেছে। মানুষের জীবনে তাই প্রেম আসে একবার, আর আসে না, কারণ একটি প্রেমই মানুষের যৌবনকে ব্যবহার করে জীর্ণ করে দিয়ে যায়। হৃদয় বলে মানুষের কাব্যে উল্লিখিত একটি যে শতদল আছে, তার বিকাশ স্বাভাবিক নিয়মে একবারই হয়, তারপর সুরু হয় ঝরে যাবার আয়োজন। সাধারণ হৃদয়, প্রতিভাবানের হৃদয়, সমস্ত হৃদয় এই অখণ্ডনীয় নিয়মের অধীন, কারো বেলা এর অন্যথা নেই।

সুপ্রিয়ার ফিরতে দেরী হল। সে একেবারে হেরম্বের খাবার নিয়ে আসায় বোঝা গেল যে শুধু অশোককে শান্ত করতেই তার এতক্ষণ সময় লাগে নি।

খাবার খেয়ে ঠাণ্ডা হয়ে হেরম্ব বলল, 'তোর উপরে রাগ হচ্ছিল, সুপ্রিয়া।'

সুপ্রিয়া খুসী হয়ে বলল, 'সত্যি ? কখন ?'

'এই মাত্র। খিদেয় অন্ধকার দেখছিলাম।'

'খিদেয় ? আমাকে না দেখে নয় ?'

হেরম্ব হাই তুলে বলল, 'একটা বালিশ এনে দেত, ঘুমব।'

সুপ্রিয়া একটি অত্যন্ত কুটিল প্রশ্ন করল।

'কেন ? রাত জাগেন বুঝি, ঘুমোবার সময় পান না ?'

হেরম্বও সমান কুটিলতার সঙ্গে জবাব দিল, 'সময় পাই বৈকি। রাত

দশটা বাজতে না বাজতে ওখানকার সবাই, আনন্দ শুদ্ধ, ঢুলতে ঢুলতে যে যার ঘরে গিয়ে দরজা দেয়। তারপর সারারাত নিষ্কর্ম্মা ঘুম দিলে আমায় ঠেকায় কে!'

সুপ্রিয়া লজ্জা পেল।—'বানিয়ে বানিয়ে এত কথা আপনি বলতে পারেন! কিন্তু আপনার শরীর যে রেটে খারাপ হয়েছে তাতে মনে হয় না ঠিক মত আহার-নিদ্রা হয়।'

'রেটটা তোরও কম নয়, সুপ্রিয়া।'

'আমার অসুখ, ফিটের ব্যারাম। আমার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আপনার শরীর খারাপ হবে কেন?'

'আমারও হয় তো অসুখ, সুপ্রিয়া।'

সুপ্রিয়া হেসে বলল, 'তর্কে হারবার উপক্রমেই অসুখ হয়ে গেল? বসুন, বালিশ এনে দিচ্ছি,—ওয়ার পরিয়ে আনতে হবে। এমন আলসে হয়েছি আজকাল, ময়লা বালিশে শুয়ে থাকি তবু ওয়ার বদলাই না। এবার আমি মরব নাকি?'

বালিশ নিয়ে সুপ্রিয়া ফেরার আগে এল অশোক।

'দুপুরে এখানেই খাবেন দাদা।'

তার আমন্ত্রণের এই অমায়িক সুরে হেরম্ব বুঝতে পারল সুপ্রিয়া সত্য সত্যই অশোককে শান্ত করতে পেরেছে। সুপ্রিয়ার এ ক্ষমতা তার অভিনব মনে হল না। অশোকের প্রতি সুপ্রিয়ার যে গভীর ও আন্তরিক মমতা আছে, অশোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি যে নিবিড় মনোযোগ ও অক্লান্ত সেবায় তার এই মমতা প্রকাশ পায়, অশোকের অতিরিক্ত দুঃখ ও অপমান মুছে নেবার পক্ষে তাই যথেষ্ট। সুপ্রিয়ার প্রকৃতি শান্ত, সে

বিশ্বাস করে মানুষ মাথাপাগলা নয়, বাস্তব জগতে ভাব নিয়ে মানুষের দিন কাটে না। যার জীবনে যা কিছু প্রয়োজন তার সে সমস্তই পাওয়া চাই। জীবন নষ্ট করবার জন্য নয়, নিজের জন্য চাইতে এবং নিতে, যতটা পারা যায় পরকে পাইয়ে দিতে, কারো লজ্জা নেই। নিজের জীবন গুছিয়ে নেওয়া চাই, পরের জীবন সাজিয়ে দেওয়া চাই। হেরম্বের জন্য অশান্তি, উদ্বেগ, সন্দেহ, ঈর্ষ্যা প্রভৃতি যতগুলি পীড়াদায়ক অনুভূতি আছে তার প্রায় সবগুলি অনুভব করে দিন কাটানোর ফলে ফিটের ব্যারাম জন্মে যাওয়া সত্ত্বেও উপরোক্ত মনোভাবের দরুণ সুপ্রিয়ার কথায় ব্যবহারে সর্ব্বদা এমন একটি কোমল ভাব ও সহানুভূতির সঙ্গে চারিদিক হিসাব করে চলবার আন্তরিক চেষ্টা প্রকাশ পায় যে, তার সম্বন্ধেও মানুষকে সে বিবেচনা করে চলতে শেখায়। সে যাকে ব্যথা দেয় নিদারুণ ক্রোধের সময়ও তাকে স্মরণ রাখতে হয় যে উপায় থাকলে ব্যথা সে দিত না। সুপ্রিয়ার বিরুদ্ধে মনে নালিশ পুষে রাখা কঠিন।

হেরম্ব অশোকের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল। বলল, 'বেশ তো!'

'আর বিকেলে যদি পারেন ওকে একবার মন্দির স্বর্গদ্বার-টার যা দেখবার আছে দেখিয়ে আনবেন। আমার নিজের তো ক্ষমতা নেই নিয়ে যাবো!'

'আচ্ছা।'

অশোক চুপি চুপি বলল, 'আমার কি ভীষণ সেবাটাই যে ও করছে দাদা, বললে আপনার বিশ্বাস হবে না। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই, ঘুম নেই, নিজের চোখে যে না দেখেছে—এখনো যথেষ্ট

করছে। ও মনে করে আমি বুঝি কিছুই চেয়ে দেখি না, আমার কৃতজ্ঞতা নেই। কিন্তু আপনাকে বলে রাখছি, ওর সেবা আমি কখনো ভুলব না।'

হেরম্ব বলল, 'তুমি ভুল করছ অশোক, ও কৃতজ্ঞতা চায় না।'

'জানি, জানি। ওর মন কত উঁচু আমি জানি না!'

সুপ্রিয়া বালিশ নিয়ে ফিরে আসায় এ প্রসঙ্গ থেমে গেল। অশোককে এ ঘরে দেখে সুপ্রিয়া সন্দিগ্ধ ভাবে দু'জনের মুখের দিকে চেয়ে দেখতে লাগল। বালিশটা মাদুরে ফেলে দিয়ে বলল, 'হেরম্ববাবু এখন ঘুমোবেন। চল আমরা যাই।'

অশোক উঠল।—'আমি ওঁকে এ বেলা খাবার নেমন্তন্ন করেছি, সুপ্রিয়া।'

'বেশ করেছ। নিজে রাঁধগে, আমি পারব না।'

বলে সুপ্রিয়া হাসল। সুপ্রিয়াকে এত ঠাণ্ডা হেরম্ব আর কখনো দেখে নি।

বজ্রপাতের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে হেরম্ব দেখতে পায় তার ঘুমের অবসরে আকাশে মেঘের সঞ্চার হয়ে বাইরে দারুণ দুর্যোগ ঘনিয়ে এসেছে। বাতাস বইছে সাঁ সাঁ শব্দে, উত্তাল সমুদ্রের গর্জ্জন বেড়ে গেছে। উঠে ঘরের বাইরে যেতে গিয়ে হেরম্ব অবাক হয়ে যায়। দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। ডাকাডাকি শুনে সুপ্রিয়া এসে দরজা খুলে দেয়। ভারি তালা খোলার শব্দ হেরম্ব শুনতে পায়।

দরজা খুললে তালাটিকে সে খুঁজে পায় না। সন্দিগ্ধ হয়ে বলে, 'দেখি তোর হাত? ওটা নয়, আঁচলের নীচে যেটা লুকিয়েছিস।'

'কেন?'

'দেখা কি লুকিয়েছিস। তালা বুঝি? দরজায় তালা দেওয়ার মানে?'

সুপ্রিয়া হেসে বলে, 'মানে আর কি, পালিয়ে না যেতে পারেন তাই। যে পালাই পালাই স্বভাব।'

হেরম্ব বলে, 'আমার ঘুমের মধ্যে অশোক বুঝি ছোরা হাতে এদিকে আসছিল?'

সুপ্রিয়া গলা নামিয়ে বলে, 'আস্তে কথা কইতে পারেন না?—তা আসে নি। আসতে পারত তো!'

হেরম্ব হেসে বলে, 'ও, তোর শুধু সন্দেহ! তুই সত্যি দারোগার বৌ, সুপ্রিয়া। সে গেছে কোথায়?'

'ছাতে।'

'এই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে ছাতে?'

'সমুদ্র দেখতে গেছে। বললে, ঝড় উঠলে সমুদ্র কেমন দেখায় দেখবার এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়। আমাকেও জোর করে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। একটু ধস্তাধস্তি করে পালিয়ে এসেছি।'

'ধস্তাধস্তি কেন?'

'কারণ ছিল বৈকি। আমায় ধাক্কা দিয়ে ছাদ থেকে ফেলে দেবার চেষ্টা করেছিল। যত সব বিদ্ঘুটে খেয়াল!'

হেরম্ব ফিরে গিয়ে মাদুরে বসল। ঘরের জানালা দু'টি বায়ুর গতির দিকে খোলে, বন্ধ করার দরকার হয় নি। বাইরে এমন দুর্যোগ নামলে

আনন্দ তার ঘরে সমুদ্রের ঝিনুক নিয়ে খেলা করে, তার যখন খুসী তাকায়, যখন খুসী কথা বলে। তাদের নিজেদের প্রেমের সমস্যা ছাড়া সে ঘরে দুর্ভাবনার প্রবেশ নিষেধ। কারো জীবনের প্রভাব সেখানে নেই, সুপ্রিয়ারও নয়,—তাকে সে ভুলে যায়। কিন্তু সুপ্রিয়ার কাছে থাকলে একটি বেলার জন্যও তার রেহাই নেই। আবহাওয়া অবিলম্বে বৈদ্যুতিক হয়ে ওঠে। দুর্ঘটনা ঘটে, দুঃসংবাদ পাওয়া যায়। তাদের মাঝখানে আর একটি জীবনের নাটকীয় অভিনয় ঘটে চলে। বাড়ীর ছাদের ভয়ঙ্কর ঘটনাটুকুর সংবাদ সুপ্রিয়া তাকে কেন দিয়েছে বুঝে হেরম্বের বড় কষ্ট হয়। সুপ্রিয়াও কি মালতী হয়ে উঠল ?

'কি হয়েছিল ?' হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল।

'শুনে অবিচার করবেন না। আমাকে ছাদে ডেকে নিয়ে যাবার সময় ওর কোন মতলব ছিল না, শুধু ছেলেমানুষী খেয়াল। আমাকে ধারে দাঁড়াতে দেখে লোভ সামলাতে পারে নি। হঠাৎ 'সুপ্রিয়া' বলে চেঁচিয়ে ধাঁ করে আমায় জড়িয়ে ধরলে। আর একটু হলেই দু'জনে একসঙ্গে—'

'তোর কথা আমি বিশ্বাস করি না, সুপ্রিয়া।'

সুপ্রিয়া কোনদিন কলহ করে নি, আজও করল না। তার চোখে শুধু জল এল। হেরম্ব একটু নরম হয়ে বলল, 'তুই ইচ্ছে করে মিথ্যা বলেছিস, তা বলছি না সুপ্রিয়া। তুই বুঝতে পারিস নি।'

'আমি কিছুই বুঝতে পারি না।'

হেরম্ব খানিকক্ষণ স্তব্ধ থেকে বলল, 'ঝড়-বাদলে খোলা ছাদে তোকে কাছে পেয়ে হঠাৎ মনের আবেগে—'

সুপ্রিয়া হাত বাড়িয়ে হেরম্বর পা ছুঁয়ে বলল, 'বিশ্লেষণ করবেন না, আপনার পায়ে পড়ি। আবেগ!—আকাশ থেকে বৃষ্টির মত আবেগ গড়িয়ে পড়ছে!'

হেরম্ব আশ্চর্য্য হয়ে বলল, 'তুই বুঝি আবেগে বিশ্বাস করিস না, সুপ্রিয়া?'

সুপ্রিয়া জবাব না দিয়ে চোখ মুছে ফেলল।

এরা কেউ বিশ্লেষণ ভালবাসে না, সুপ্রিয়াও নয়, আনন্দও নয়। তার একি অভিশাপ যে, এরা কেন বিশ্লেষণ ভালবাসে না বসে বসে তাও বিশ্লেষণ করতে ইচ্ছা হয়? একি জ্ঞানের জন্য? নারীকে জেনে সে কি জীবনের নাড়ীজ্ঞান আয়ত্ত করতে চায়? তার লাভ কি হবে? বরং আজ পর্য্যন্ত তার যা ক্ষতি হয়েছে তার তুলনা নেই। জীবনের সমস্ত সহজ উপভোগ তার বিষাক্ত বিস্বাদ হয়ে যায়।

সুপ্রিয়া তার মুখের ভাব লক্ষ্য করছিল। একটু ভয়ে ভয়ে বলল, 'ওকে নামিয়ে আনবেন না? ভিজে ভিজে মরবে নাকি!'

'না, সেটা ঘটতে দেওয়া উচিত হবে না।' বলে হেরম্ব উঠে দাঁড়াল।

অশোককে নামিয়ে এনে স্নানাহার করতে করতে বৃষ্টি থেমে গেল। হেরম্ব বিদায় নিল। বলে গেল, বিকালে যদি পারে একবার আসবে, সুপ্রিয়াকে যে সব জায়গা দেখিয়ে আনবার কথা আছে দেখিয়ে আনবে।

'যদি পারি কেন?'

'না পারলে কি করে আসব, সুপ্রিয়া?'

'চারটের মধ্যে যদি না আসেন তাহলে ধরে নেব, আপনি আর এলেন না।'

'যদি আসি চারটের মধ্যেই আসব।'

বাগানে ঢুকতেই আনন্দের দেখা পাওয়া গেল। সে রুদ্ধশ্বাসে বলল, 'এত দেরী করলে! মা এদিকে ক্ষেপে গেছে।'

আনন্দ সংবাদটা এমন ভাবে দিল যে হেরম্ব বুঝে নিল মালতীর ক্ষেপবার কারণ সুপ্রিয়ার সঙ্গে গিয়ে তার ফিরতে দেরী করা। সে রুক্ষস্বরে বলল, 'ক্ষেপলে আমি কি করব?'

আনন্দ বলল, 'মন্দির থেকে বাড়ীতে এসে মা যেই দেখল বাবা নেই, বাবার কম্বল, বই, খাতা এসবও নেই, মা ঠিক যেন পাগল হয়ে গেল।'

হেরম্ব আশ্চর্য্য হয়ে বলল, 'মাষ্টারমশায় গেলেন কোথায়?'

'বাবা চলে গেছে।'

'কোথায় চলে গেছেন?'

আনন্দের চোখ ছল্ ছল্ করে এল।

'তা জানিনে তো। তোমার কাছ থেকে যখন টাকা নিয়ে দিলাম, তখন কিছু বললেন না। তোমরা চলে যাবার পর বাবা আমাকে ডেকে চুপি চুপি বললেন, আমি যাচ্ছি আনন্দ, তোর মাকে বলিস না, গোল করবে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় যাচ্ছ বাবা, কবে ফিরবে? বাবা জবাবে শুধু বললেন, সে সব কিছু ঠিক নেই। আমি বুঝতে পেরে কাঁদতে লাগলাম।'

বলে আনন্দ চোখ মুছতে লাগল। হেরম্ব তাকে একটি সান্ত্বনার কথাও বলত পারল না। বাতাসের নাড়া খেয়ে গাছের পাতা থেকে জল ঝরে পড়ছে, আনন্দ প্রায় ভিজে গিয়েছিল। তাকে সঙ্গে করে হেরম্ব ঘরে গেল। ঘরের জানালা কেউ বন্ধ করে নি। বৃষ্টির জলে মেঝে ভেসে গিয়েছে। হেরম্বের বিছানাও ভিজেছে। বিছানাটা উল্টে নিয়ে হেরম্ব তোষকের নীচে পাতা শুকনো সতরঞ্চিতে বসল। বলার অপেক্ষা না রেখে আনন্দও তার গা ঘেঁসে বসে পড়ল। সে অল্প অল্প কাঁপছিল, জলে ভিজে কিনা বলবার উপায় নেই। হেরম্বের মনে হল, সান্ত্বনার জন্য যত নয়, নির্ভরতার জন্যই আনন্দ ব্যাকুল হয়েছে বেশী। এরকম মনে হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ ভেবে না পেয়ে হেরম্ব তাকে সান্ত্বনাও দিল না, নির্ভরতাও দিল না। সে বরাবর লক্ষ্য করেছে এরকম অবস্থায় ঠিক মত না বুঝে কিছু করতে গেলে হিতে বিপরীত হয়।

আনন্দ বলল, 'মা কি করেছে জান? বাবাকে টাকা দিয়েছি বলে আমাকে মেরেছে।' হেরম্বের দিকে পিছন ফিরে পিঠের কাপড় সে সরিয়ে দিল, 'ছ্যাখ, কি রকম করে মেরেছে। এখনো ব্যথা কমে নি। ঘসা লেগে জ্বালা করে বলে জামা গায়ে দিতে পারি নি, শীত করছে, তবু। কি দিয়ে মেরেছে জান? বাবার ভাঙ্গা ছড়িটা দিয়ে।'

তার সমস্ত পিঠ জুড়ে সত্যই ছড়ির মোটা মোটা দাগ লাল হয়ে উঠেছে। হেরম্ব নিঃশ্বাস রোধ করে বলল, 'তোমায় এমন করে মেরেছে!'

আনন্দ পিঠ ঢেকে দিয়ে বলল, 'আরও মারত, পালিয়ে গেলাম বলে পারে নি। বৃষ্টির সময় মন্দিরে বসেছিলাম। তুমি যত আসছিলে না,

আমি একেবার মরে যাচ্ছিলাম। তিনি বুঝি আসতে দেন নি, যার সঙ্গে গেলে?'

'হ্যাঁ, তার স্বামী আমাকে না খাইয়ে ছাড়লে না। পিঠে হাত বুলিয়ে দেব আনন্দ?'

'না, জ্বালা করবে।'

হেরম্ব ব্যাকুল হয়ে বলল, 'একটা কিছু করতে হবে তো! নইলে জ্বালা কমবে কেন? আচ্ছা সেঁক দিলে হয় না?' বলে হেরম্ব নিজেই আবার বলল, 'তাতে কি হবে।'

'এখন জ্বালা কমেছে।'

'কমে নি, জ্বালা টের পাচ্ছ না। তোমার পিঠ অসাড় হয়ে গেছে। বরফ ঘষে দিতে পারলে সব চেয়ে ভাল হত।'

'তা হত। কিন্তু বরফ তো নেই। তুমি বরং আস্তে আস্তে হাত বুলিয়েই দাও।'

'বস, বরফ নিয়ে আসছি।'

আনন্দের প্রতিবাদ কানে না তুলে হেরম্ব চলে গেল। সহর পর্য্যন্ত হেঁটে যেতে হল। বরফ কিনে সে ফিরে এল গাড়ীতে। আনন্দ ইতিমধ্যে মেঝের জল মুছে ভিজে বিছানা বদলে ফেলেছে। সে যে সোনার পুতুল নয় এই তার প্রমাণ।

এত কষ্ট করে বরফ সংগ্রহ করে এনেও এক ঘণ্টার বেশী আনন্দের পিঠে ঘষে দেওয়া গেল না। বরফ বড় ঠাণ্ডা। আনন্দ চুপ করে শুয়ে রইল, হাত গুটিয়ে বসে রইল হেরম্ব। যে কোন কারণেই হোক, আনন্দকে মালতী যে এমন ভাবে মারতে পারে সে যেন তা ভাবতেই পারছিল না।

মেঘ কেটে গিয়ে এখন আবার কড়া রোদ উঠেছে। পৃথিবীর উজ্জ্বল মূর্ত্তি এখনো সিক্ত এবং নম্র। আনন্দকে শুয়ে থাকতে হুকুম দিয়ে হেরম্ব বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল।

মালতী কখন থেকে বারান্দায় এসে বসেছিল। হেরম্বকে সে কাছে ডাকল। হেরম্ব ফিরেও তাকাল না। মালতী টল্‌তে টল্‌তে কাছে এল। বেশ বোঝা যায়, মাত্রা রেখে আজ সে কারণ পান করে নি। কিন্তু নেশায় তার বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয়েছে বলে মনে হল না।

'সাড়া দাও না যে !'

'কারণ আছে বৈকি।'

মালতী বোধ হয় দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না। সেইখানে থুপ্ করে বসল।—'শুনি, কারণটা শুনি।'

'সেটুকু বুঝবার শক্তি আপনার আছে, মালতী-বৌদি।'

মালতী এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল। গলা যথাসাধ্য মোলায়েম করে বলল, 'আর মালতী-বৌদি কেন হেরম্ব?—কেমন খারাপ শোনায়। ভাবছি আজকালের মধ্যেই তোমাদের কণ্ঠিবদলটা সেরে দেব, আর দেরী করে লাভ কি ? কণ্ঠিবদলে তোমার আপত্তি নেই তো ? আপত্তি কোর না, হেরম্ব। আমরা বৈষ্ণব, তোমার মাষ্টারমশায়ের সঙ্গে আমারো কণ্ঠিবদল হয়েছিল। তোমাদেরও তাই হোক, তারপর তুমি তোমার তিন আইন চার আইন যা খুসী কর, আমার দায়িত্ব নেই, ধর্ম্মের কাছে আমি খালাস।'

সুপ্রিয়া যতদিন পুরীতে উপস্থিত আছে ততদিন এসব কিছু হওয়া সম্ভব নয়। সুপ্রিয়ার কাছে এখনো সে সেই ছ'মাসের প্রতিশ্রুতিতে

আবদ্ধ, তার সঙ্গে একটা বোঝা-পড়া হয়ে যাওয়া দরকার। আনন্দকে চোখে দেখে গিয়েও সুপ্রিয়া তাকে রেহাই দেয় নি। স্পষ্টই বোঝা যায় সেকালের নবাব-বাদশার মত সে যদি সুন্দরীদের একটি হারেম রাখে, সুপ্রিয়া গ্রাহ্য করবে না, তার ভালবাসা পেলেই হল। এমন একদিন হয়ত ছিল যখন দেখা হওয়া মাত্র হেরম্ব সুপ্রিয়ার সঙ্গে তার সেই ছ'মাসের চুক্তি বাতিল করে দিতে পারত। এখন মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিতে তার সময় লাগে। কণ্ঠিবদল কিছুদিন এখন স্থগিত না রেখে উপায় নেই।

শুনে মালতী সন্দিগ্ধ হয়ে কারণ জানতে চাইল। হেরম্ব সোজাসুজি মিথ্যা বলল। বলল যে, পূর্ণিমা আসুক, আগামী পূর্ণিমায় যা হয় হবে। ইতিমধ্যে অনাথ ফিরে আসতে পারে। অনাথের জন্য কিছুদিন অপেক্ষা করা সঙ্গত নয় কি ?

মালতী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি মনে হয় হেরম্ব ও আর ফিরবে ?'

'ফিরতে পারেন বৈকি।'

মালতী বিশ্বাস করল না। 'না, সে আর ফিরছে না, হেরম্ব। মিন্‌সে জন্মের মত গেছে।'

হেরম্ব বলল, 'নাও যেতে পারেন, হয়ত কালকেই তিনি ফিরে আসবেন। আনন্দকে মিছামিছি মেরেছেন।'

মালতী অল্প একটু গরম হয়ে বলল, 'মিছামিছি ! ওর বাবার ভাগ্যি কাল ওকে খুন করি নি। কে জানত পেটের মেয়ে আমার এমন শত্তুর হবে !'

হেরম্ব এবার রূঢ় কণ্ঠে বলল, 'কি শত্রুতা করল ভেবে পাই না।

টাকা দশটা যোগাড় করে না দিলে কি তার যাওয়া হোত না? যে যেতে চায় অত সহজে তাকে আটকানো যায় না মালতী-বৌদি।'

মালতী বলল, 'তুমি ছাই বোঝ। টাকা যোগাড় করে দেওয়ার জন্য নাকি! আমাকে না জানিয়ে ও চুপ করে রইল কোন্ হিসাবে? আমি টের পেলে কি সে যেতে পারত হেরম্ব!'

দু'হাতে ভর দিয়ে পিছনে হেলে মালতী আবার বলল, 'অদেষ্ট দেখেছ, হেরম্ব? আজ আমার জন্মদিন, জ্বালাতন করব, তাই পালিয়ে গেল।' মালতীর গাল আর চিবুকের চামড়া কুঞ্চিত হয়ে আসছিল, রক্তবর্ণ চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।—'একেবারে পাগল হেরম্ব, উন্মাদ! গেছে যাক, আজ দেখব কাল দেখব, তারপর ঘরদোরে আমিও ধরিয়ে দেব আগুন।...ওলো সর্ব্বোনাশী, উঁকি মেরে দেখিস কোন্ লজ্জায়? আয়, ইদিকে আয়, হতভাগি!'

আনন্দ আসে না। হেরম্ব তাকে ডেকে বলল, 'এস, আনন্দ।'

আনন্দ কুণ্ঠিত পদে কাছে এলে মালতী খপ্ করে তার হাত ধরে ফেলল। কাছে বসিয়ে পিঠের কাপড় সরিয়ে আঘাতের চিহ্ন দেখে বলল, 'তোরও কি মাথা খারাপ হয়েছিল, আনন্দ? লক্ষীছাড়া মেয়ে, তুই পালিয়ে যেতে পারলি না?'

আনন্দ মুখ গোঁজ করে বলল, 'গেলাম তো পালিয়ে।'

'পালিয়ে গেলি তো এমন করে তোকে মারল কে শুনি?' মালতীর গলা হতাশায় ভেঙ্গে এল, 'গোঁয়ার! যেমন গোঁয়ার বাপ তেমনি গোঁয়ার মেয়ে। ঠায় দাঁড়িয়ে মার খেয়েছে। যত বলি যা আনন্দ, চোখের সমুখ থেকে সরে যা, মেয়ে তত এগিয়ে এসে মার খায়।'

মাতা ও কন্যার মিলন হল এইভাবে। হেরম্বের না হল আনন্দ, না হল স্বস্তি। নূতন ধরণের যে বিষাদ তার এসেছে তাতে সবই যেন তার মনে হচ্ছে সাধারণ, স্বাভাবিক।

তারপর মালতী জিজ্ঞাসা করল, 'পিঠে নারকেল তেল দিতে পারিস নি একটু ?'

বরফ দেওয়ার কথাটা কেউ উল্লেখ করল না। হেরম্বকে দিয়ে তেলের শিশি আনিয়ে মালতী মেয়ের পিঠে মাখিয়ে দিতে আরম্ভ করল।

আনন্দকে প্রহার করেই মালতী শান্ত হয়ে যাবে হেরম্ব সে আশা করেনি। অনাথ যে সত্য সত্যই চিরদিনের মত চলে গেছে তাতে সেও সন্দেহ করে না। মৃত্যুর চেয়ে এভাবে প্রিয়জনকে হারানো বেশী শোকাবহ। এই শোক মালতীর মধ্যে ঠিক কি ধরণের উন্মত্ততায় অভিব্যক্ত হবে তাই ভেবে হেরম্ব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। মালতীর শান্ত ভাবটা সে ঠিক বুঝতে পারল না। কারণের প্রভাব হওয়া আশ্চর্য্য নয়।

ওদিকে সুপ্রিয়ার সমস্যা আছে। চারটের মধ্যে সুপ্রিয়ার কাছে তার হাজির হবার কথা। ঘড়ি দেখে বোঝা গেল এখন আর তা সম্ভব নয়, চারটে বাজে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত গিয়ে উপস্থিত হলে দেরী করে যাওয়ার অপরাধ সুপ্রিয়া ধরবে না। যেতেই হেরম্বের ক্লান্তি বোধ হচ্ছে।

তাকে সামনে পেলে সুপ্রিয়া ক্ষণে ক্ষণে নবজাগ্রত আশায় উৎফুল্ল হয়, ক্ষণে ক্ষণে ব্যথায় মলিন হয়ে যায়। হেরম্বের চোখের দৃষ্টিতে মুখের কথায় আজও সে অদম্য আগ্রহে অনুসন্ধান করে প্রেম, নিজেরই সুদীর্ঘ

তপস্যার অন্ধ-শক্তিতে পলে পলে হতাশাকে জয় করে চলে। তার কাছে হেরম্বকে প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত সাবধান হয়ে থাকতে হয়। ক্রমাগত সুপ্রিয়ার চিত্তকে ভিন্নাভিমুখী করার চেষ্টায় মাঝে মাঝে তার ভ্রান্তি জন্মে যায়, সুপ্রিয়ার প্রেমকে হত্যা করার বদলে সে বুঝি প্রশ্রয় দিয়েই চলেছে। হেরম্বের সব চেয়ে মুস্কিল হয়েছে এই যে, আনন্দের সংশ্রবে এসে তার মন এমন দুর্ব্বল হয়ে উঠেছে কারো প্রতি কল্যাণকর নিষ্ঠুরতা দেখাবার শক্তি তার নেই। রূপাইকুড়ায় গভীর রাত্রে সুপ্রিয়া যেমন সোজাসুজি তার দাবী জানিয়েছিল, আজও যদি সে তেমনিভাবে স্পষ্টভাষায় তাকে প্রার্থনা করে, জীবন থেকে তাকে বরখাস্ত করে দেওয়া হেরম্বের পক্ষে হয়ত সহজ হয়। কিন্তু সুপ্রিয়া তাদের সেই ছ'মাসের চুক্তিকে আঁকড়ে ধরে আছে। এদিকে আজকাল কেবল নিজের এবং একান্ত নিজস্ব যে, তার সুখ-দুঃখের কথা ভাবার মত সঙ্গত স্বার্থপরতা হেরম্বের কাছে হয়ে উঠেছে লজ্জাকর। সুপ্রিয়া যদি দু'দণ্ড তার সঙ্গে কথা বলে শান্তি পায়, তার দীর্ঘকালব্যাপী জীবন-পণ ভালবাসার কথা স্মরণ করে তাকে বঞ্চিত করার অধিকার নিজের আছে বলে হেরম্ব ভাবতে পারে না। এদিক দিয়ে বিচার করে হেরম্ব চিনতেও পারে না নিজেকে। সে ছিল কঠিন, মানুষের ছোট বড় সুখ-দুঃখের কোন মূল্য তার কাছে ছিল না, কারো হৃদয়কে সে কোনোদিন খাতির করে চলে নি। আজ শুধু কোমল হওয়া নয় গলিত বরফের মত সে তরল হয়ে গেছে, যে যেখানে তৃষার্ত্ত আছে তারই অঞ্জলিতে নিজেকে সে বিলিয়ে দিতে চায়।

ঘরে বসে উদ্বেগ ও অশান্তিতে হেরম্ব কাতর হয়ে পড়ে। আবার তার পালিয়ে যেতে ইচ্ছা হয়। জীবন যখন রণক্ষেত্রে পরিণত হয়ে গেছে

তখন আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খেয়ে লাভ কি? সুপ্রিয়ার আবির্ভাব হওয়া মাত্র তার যদি এই অবস্থা হয়ে থাকে, শেষ পর্য্যন্ত কি অবস্থা দাঁড়াবে কে বলতে পারে?

যে তেজ, যে প্রচণ্ড গতির অবসান হয়ে গেছে তার জন্য হেরম্বের মন হাহাকার করে। একদিন যা দিয়ে সে মানুষের বুকও ভেঙ্গেছে ঘরও ভেঙ্গেছে, আজ সে শক্তি থাকলে সে মহামানবের মত ভাঙ্গা বুক জোড়া দিতে পারত, ভাঙ্গা ঘর গড়ে তুলতে পারত। মনে জোর থাকলে জীবনে সমস্যা কোথায়? মালতী, সুপ্রিয়া ও আনন্দকে নিয়ে বিপুল পৃথিবীর এককোণে ঠাঁই বেছে নেওয়া কঠিন নয়, জীবনের দুটি প্রান্তে সুপ্রিয়া ও আনন্দকেও এমন ভাবে রেখে দেওয়া অসম্ভব নয়, যাতে নিজস্ব সীমা তাদের কোনদিন চোখে পড়বে না, খণ্ডিত হেরম্বকে দিয়েও জীবনের পূর্ণতা সাধিত হওয়ায় কোনদিন তারা অনুভব করতে পারবে না নিজেকে দু'ভাগে ভাগ করে দু'জনকেই সে ঠকিয়েছে। একদিন হেরম্বের পক্ষে এ কাজ সম্ভব ছিল। আজ এ শুধু কল্পনা, অক্ষমের দিবাস্বপ্ন।

সত্যই কল্পনা। আজ সারাদিন, বিশেষভাবে আনন্দের পিঠে বরফ ঘষে দেবার সময়, এই দিবাস্বপ্নই সে দেখেছে। সুপ্রিয়া থাকে জনপদের একটি দ্বিতল গৃহে, তার ছবির মত সাজানো ঘরে সারাদিন হেরম্ব গৃহস্থ সংসারী, সন্ধ্যায় সে ফিরে যায় আনন্দের স্বহস্তে রোপিত ফুলগাছে সাজানো বাগানে ঘেরা শান্ত নির্জ্জন কুটিরে। সুপ্রিয়া তাকে রেঁধে খাওয়ায়, আনন্দ তাকে দেখায় চন্দ্রকলা নাচ। তার মধ্যে যে ক্ষুধিত অসন্তুষ্ট দেবতা আছেন হেরম্ব তাকে এমনি সব উদ্‌ভ্রান্ত কল্পনার নৈবেদ্য নিবেদন

করে। নিবেদন করে সসঙ্কোচে। প্রায় সজল চোখে। তার কি বুঝতে বাকী আছে যে, এই ভ্রান্ত আত্মপূজা তার বার্দ্ধক্যের পরিচয়, এই সব রঙীন কল্পনা তার কৈশোরের ফিরে আসার লক্ষণ নয়, যৌবন-অপরাহ্ণের মৃত্যু-উৎসব।

মালতী আজ হেরম্বকে বেদখল করেছে। দশ মিনিটের বেশী একা থাকতে দেয় না।

বলে, 'মিন্‌সে যদি আর একটা দিন থেকে যেত, আমার জন্মদিনের উৎসবটা হতে পারত। যাক্, কি আর হবে, গেছেই যখন মরুকগে' যাক। তারও শান্তি, আমারও শান্তি।'

'শান্তিই মানুষের সব।' হেরম্ব সংক্ষেপে বলে।

মালতী হেসে বলে, 'খুব একটা মস্ত কথা বললে তো! আসল কথাটা জান, হেরম্ব? আমায় আর দেখতে পারত না। ওসব যোগটোগ মিছে কথা, ভণ্ডামি। একজনকে দেখতে না পারলেই মানুষের ওসব ভণ্ডামি আসে। কই, সংসারে বিরাগ না এলে সন্ন্যেসী হতে দেখলাম না তো কাউকে! ভোগ ভাল না লাগলে তখন তোমাদের ধর্ম্মে মতি হয়। তোমরা পুরুষ মানুষেরা হলে কি বলে গিয়ে সুখের পায়রা। যখন যাতে মজা লাগে তাই তোমাদের ধর্ম্ম। ঘেন্নার জাত বাপু তোমরা।'

শেষ পর্য্যন্ত মালতীকে সহ্য করতে না পেরেই হেরম্ব পথে বেরিয়ে গেল।

আনন্দ জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি বুঝি তাঁর বাড়ী যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। তুমি বারণ করলে যাব না।'

'বারণ করব কেন?'

'সন্ধ্যার সময় ফিরে আসব, আনন্দ।'

আনন্দ ম্লান মুখে বলল, 'তাই এস, আমার আজ বড় মন কেমন করছে।' হেরম্ব ইতস্ততঃ করে বলল, 'তবে না হয় নাই গেলাম, আনন্দ। চল, আমরা সমুদ্রের ধার থেকে বেড়িয়ে আসি।'

আনন্দ বলল, 'না, আমি মা'র কাছে থাকব।'

হেরম্ব আর দ্বিধা করল না। 'থাক্, আমি যাব না, আনন্দ। যেতে বলেছিল একবার, কাল গেলেই হবে।'

কিন্তু আনন্দ তাকে মত পরিবর্ত্তন করতে দিল না। বলল, 'না, যাও। না গেলে তিনি আবার এসে হাজির হবেন তো! এখন দেখা করে এস, সন্ধ্যার পরে তুমি আর কোথাও যেও না, আমার কাছে থেক।'

হেরম্ব জানত সুপ্রিয়া তার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকবে। দেরী দেখে হয়ত মাঝে মাঝে পথের দিকেও তাকাবে। কিন্তু বাড়ীর কাছাকাছি পৌছানো মাত্র সুপ্রিয়া বেরিয়ে এসে তার সঙ্গে যোগ দেবে হেরম্ব তা ভাবতে পারে নি। সুপ্রিয়ার পক্ষে এতখানি অধীরতা কল্পনা করা কঠিন।

সুপ্রিয়া নিজে থেকে কৈফিয়ৎ দিল।

'ওঁর দাদা বৌদি এসে পড়েছে। চলুন আমরা পালাই।'

'পালাই? পালাই কিরে?'

সুপ্রিয়া ব্যাকুল হয়ে বলল, 'সরে চলুন এখান থেকে, কেউ দেখতে পাবে। হেঁয়ালি বুঝবার সময় পাবেন ঢের।'

সে দ্রুতপদে এগিয়ে গেল। মূঢ়ের মত তাকে অনুসরণ করা ছাড়া হেরম্বের আর উপায় রইল না। সমুদ্রের ধারে পৌঁছানোর আগে পর্য্যন্ত সুপ্রিয়া মুহূর্ত্তের জন্য তার গতিবেগ শ্লথ করল না। সে যেন চুরি করে পালাচ্ছে। বঙ্গনারীর এই অস্বাভাবিক জোর চলনে পথের লোক অবাক হয়ে চেয়ে আছে লক্ষ্য করে হেরম্বের লজ্জা করতে লাগল। সুপ্রিয়ার পায়ে জুতো নেই, পরণের সাধারণ সাড়ীখানা ময়লা, তার আলগা খোঁপা খুলে গেছে। বয়সও তার কম হয় নি, চার বছর আগে একবার সে মা হয়েছিল।

তবু সমুদ্রতীর অবধি হেরম্ব চুপ করে রইল। সেখানে সুপ্রিয়া দাঁড়াতে সে মৃদু ও কড়া সুরে বলল, 'রাস্তার লোক হাসালি, সুপ্রিয়া।'

'হাসুক। মাগো, এইটুকু জোর হেঁটে হাঁপ ধরে গেছে !'

বুক ফুলিয়ে ফুলিয়ে দুর্বিনীত ভঙ্গিতে সে নিশ্বাস নেয়। সমুদ্রের বাতাসে তার আল্‌গা চুল ও অনাবদ্ধ অঞ্চলপ্রান্ত উড়তে থাকে। হেরম্ব সভয়ে স্মরণ করে, সুপ্রিয়ার এ রূপ প্রায় পাঁচ বছরের পুরোনো, যখন ছেলেমানুষ পেয়ে আনন্দের সমবয়সী সুপ্রিয়াকে সে ভুলিয়ে বিয়ে দিয়েছিল বলে রূপাইকুড়ায় সুপ্রিয়া অভিযোগ করেছে।

'দাঁড়াবেন না, চলুন।' বলে সমুদ্রের ঢেউ যেখানে পায়ের পাতা ভিজিয়ে দিয়ে যায় সেখান দিয়ে সুপ্রিয়া হাঁটতে আরম্ভ করল। রোদের তেজ এখনো কমে নি কিন্তু জোরালো বাতাস রোদের তাপ গা থেকে মুছে নিয়ে যাচ্ছে। হেরম্ব বলল, 'ব্যাপার কি বল্‌তো, সুপ্রিয়া ?'

'ব্যাপার কঠিন কিছু নয়। বাড়ীতে ভিড় জমেছে, নিরিবিলি কথা বলার জন্য সমুদ্রের ধারে বেড়াতে এলাম—শুধু এই।'

'ফিরে গিয়ে কি কৈফিয়ৎ দিবি ?'

'তার দরকার হবে না।'

নীরবে দু'জনে এগিয়ে চলল। সমুদ্রতীর পথ নয় কিন্তু হেঁটে বড় আরাম। পাশে অনন্ত সমুদ্রের গা ঘেঁষে সমুদ্রতীরও কোথায় কতদূর চলে গেছে, শেষ নেই। সঙ্গী নিয়ে নিঃশব্দে হাঁটবার সুবিধাও এইখানে, সমুদ্রের কলরব নীরবতাকে প্রচ্ছন্ন করে রাখে, পীড়ন করতে দেয় না।

অনেক দূর গিয়ে সুপ্রিয়া জিজ্ঞাসা করল, 'চিঠিতে ওই মেয়েটার কথা লেখেন নি কেন ?'

'লিখি নি ? ভুল হয়ে গিয়েছিল।'

'আমি খবর পেয়েছিলাম। ও সাক্ষী দিতে একবার পুরী এসেছিল। গিয়ে বলল আপনি এক তান্ত্রিকের আড্ডায় ডুবতে বসেছেন।'

'তান্ত্রিক নয়, বৈষ্ণব।'

'মেয়েটাকে দেখেই আমার ভাল লাগে নি। ওর মা-টা আরও খারাপ।'

হেরম্ব গম্ভীর হয়ে বলল, 'তুই বুঝি ভুলে গেছিস সুপ্রিয়া, কতকগুলি কথা আছে মুখ ফুটে যা বলতে নেই ?'

সুপ্রিয়া কলহের সুরে বলল, 'চুপ করে থাকব, না ? আমি তা পারব না। আমি মেয়েমানুষ, অত উদার আমি হতে চাই না। পারলে ওই রাক্ষসীকে আমি বিষ খাইয়ে গলা টিপে মেরে ফেলব, এই আপনাকে আমি স্পষ্ট বলে রাখলাম।'

হেরম্ব অনাথের মত অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলল, 'তুই যে ক্রমেই মালতী-বৌদি হয়ে উঠছিস, সুপ্রিয়া !'

'মালতী-বৌদি কে? ওই মা-টা বুঝি? হুঁ, ডাকের দেখি বাহার আছে!'

'চেহারার বাহারও আছে, সুপ্রিয়া।'

'তা আছে। দু'জনেরই।'

খোঁচা খেয়ে হেরম্ব একটু বিরক্ত হল। সুপ্রিয়ার এবারকার পদ্ধতিটা ভাল নয়। রূপাইকুড়ায় সে তাদের বাহ্য সম্পর্ককে প্রাণপণে ঠেলে তুলতে চেয়েছিল সেই স্তরে, যেখানে বাস্তব-ধর্ম্মী মানুষের আবেগ ও স্বপ্ন বিছানো থাকে, যেখানে রস ও মাধুর্য্যের সমাবেশ। সাধারণ যুক্তি ও বিচার-বুদ্ধিকে তুচ্ছ করে দেবার প্রবৃত্তি হেরম্ব যাতে দমন করতে না চায়, রূপাইকুড়ায় তাই ছিল সুপ্রিয়ার প্রাণপণ চেষ্টা। এবার সুপ্রিয়া তার সমস্ত নেশা টুটিয়ে দিতে চায়, সে যে প্রায় ভুলে যেতে বসেছে সে রক্ত-মাংসের মানুষ, তার এই ভ্রান্তিকে সে টিঁকতে দেবে না। আত্মবিস্মৃত পাখীর মত নিঃসীম আকাশে পাখা মেলে অনন্ত-যাত্রায় তাকে প্রস্তুত হতে দেখে এই নীড়লুব্ধা বিহঙ্গমী তার কাছে পৃথিবীর আকর্ষণ টেনে এনেছে, তাকে মনে পড়িয়ে দিচ্ছে আকাশে আশ্রয় নেই, খাদ্য নেই, পানীয় নেই। হেরম্ব ধীরে ধীরে হাঁটে। সুপ্রিয়ার ইঙ্গিত মিথ্যা নয়, রূপের বাহার ছাড়া আনন্দের আর কিছুই নেই। আনন্দের ভিতর ও বাহির সুন্দর, অপার্থিব, অব্যবহার্য্য সৌন্দর্য্যে তার দেহ-মন মণ্ডিত হয়ে আছে: সে রঙীন কালিতে ছাপানো অনবদ্য কবিতার মত। অথবা সে আকাশের মত, তার মধ্যে ডুবে গিয়েও পাখীকে নিজের পাখায় ভর করে থাকতে হয়, পাখা অবশ হলে পৃথিবীতে পতন অনিবার্য্য। আনন্দকে প্রেম ছাড়া আর কোন পূজায় পাওয়া যায় না, প্রেমের শেষ অবশ নিশ্বাসের সঙ্গে সে

হারিয়ে যাবে। সুপ্রিয়ার কাছে অভ্যস্ত বিরক্তি ও মমতার অবাধ খেলায় বিস্ময়কর স্বস্তি বোধ করে হেরম্ব কি এখন বুঝতে পারছে না, আনন্দের সান্নিধ্য তাকে অনির্ব্বচনীয় সুতীব্র সুখের সঙ্গে কি অসহ্য যন্ত্রণা দেয়? তার অর্দ্ধেক হৃদয় ভালবাসার যে পুলক সংগ্রহ করে, অপরার্দ্ধ মরণাধিক কষ্ট সয়ে তার মূল্য দেয়? সুপ্রিয়ার কাছে সে উন্মাদনা পাবার সম্ভাবনা যেমন নেই, সেরকম অসহ্য দুঃখও সে দেয় না।

তবু সেই দুঃখই তার চাই, তাকে পরিহার করা যাবে না।

'চল ফিরি।'

'চলুন আর একটু। নির্জ্জনতা গভীর হয়ে আসছে।'

'জলে ভিজে অশোকের কিছু হয় নি ত?'

হঠাৎ অশোকের কথা ওঠায় সুপ্রিয়া একটু বিস্মিত হয়ে হেরম্বের মুখের দিকে তাকাল।

'হু হু করে জ্বর এসেছে।'

'তুই যে চলে এলি?'

'ছোটলোক ভাবছেন, না? সেবা করার লোক না থাকলে আসতাম না। দাদা, বৌদি, ভাইঝি সবাই ঘিরে আছে, তারা আপনার জন। আমি তো পর!'

'তোর কি হয়েছে বল্‌তো?'

'বুঝতে পারেন নি? আমার মন আগাগোড়া বদলে গেছে। আজকাল সর্ব্বদা অন্যমনস্ক থাকি।'

হেরম্বের কাছে এটা সুপ্রিয়ার অনাবশ্যক আত্মনিন্দার মত শোনাল।

মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হতে পারলেও সর্ব্বদা অন্যমনস্ক থাকা সুপ্রিয়ার পক্ষে অসম্ভব। তার এ কথা হেরম্ব বিশ্বাস করল না।

'তুই ইচ্ছা করলেই অশোককে সুখী করতে পারতিস, সুপ্রিয়া।'

সুপ্রিয়া থমকে দাঁড়াল।

'যদি কথা তুললেন, তাহলে বলি। আমি তা পারতাম না। কেউ পারে না। ছেলেখেলা হলে পারতাম, চব্বিশ ঘণ্টা একসঙ্গে থাকা ছেলেখেলা নয়। ও বিনাদোষে মারা গেল, কিন্তু উপায় কি, সংসারে অমন অনেকে যায়। ওর সত্যি কোন উপায় নেই।'

দূর দিগন্তে চোখ রেখে হেরম্ব বলল, 'তবু অশোককে নিয়ে তুই যদি জীবনে সুখী হতে পারতিস, তাহলে তোর প্রশংসা করতাম সুপ্রিয়া।'

'কথাটা ভেবে বললেন?'

'ভেবে বললাম। মনকে তুই একেবারে উন্মুক্ত করে দিলি, কিছু ঢাকবার চেষ্টা করলি না। সত্যকে সহ্য করবার স্পর্দ্ধা দেখিয়েছিস বলেই কথাটা বললাম। বিচলিত হলে চলবে কেন? ওর ভাল-মন্দের দায়িত্ব তোরও অনেকখানি আছে বৈকি।'

সুপ্রিয়া রুক্ষস্বরে বলল, 'আপনার কথার মানে হয় না। ওর ভাল-মন্দর সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি? রূপাইকুড়াতেও আপনি আমাকে এসব বলে অপমান করতেন। আপনার ভুল হয়েছে, স্বামী আমার সমস্যা নয়, আপনিই তাকে শিখণ্ডীর মত সামনে খাড়া করে রেখে আমার সঙ্গে লড়াই করছেন।'

এবার হেরম্বের চুপ করে যাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু কোন অবস্থাতেই তর্কে হার মানা হেরম্বের স্বভাব নয়।

'লড়াই বাধাচ্ছিস তুই। আমি তো লড়াই করতে চাইনি সুপ্রিয়া।' এই কঠোর কথায় সুপ্রিয়া ক্রন্দনবিমুখ আহত শিশুর মত মুখ করে বলল, 'ইচ্ছে করে আমাকে অপমান করার জন্য একথা যদি বলতেন, ফিরে গিয়ে আমি বিষ খেতাম।'

হেরম্ব সাগ্রহে সায় দিয়ে বলল, 'ফিরে গিয়ে আমরা দু'জনেই তাই খাই চল্, সুপ্রিয়া।'

সুপ্রিয়া অতি কষ্টে বলল, 'তার চেয়ে এখানে একটু বসা ভাল।'

জলের ধার থেকে খানিক সরে শুকনো বালিতে তারা নীরবে বসে থাকে। হেরম্ব বুঝতে পারে রূপাইকুড়ায় তাদের যে ছ'মাসের চুক্তি হয়েছিল সুপ্রিয়া এখনো তা অখণ্ডনীয় ধরে রেখেছে। এখন যে তাদের অন্তরঙ্গতা বেড়েছে তাতে সন্দেহ নেই। অশোকের সম্বন্ধে যে আলোচনা তাদের হয়ে গেল, পরস্পরের কাছে দাম কমে যাবার বিন্দুমাত্র আশঙ্কা থাকলে এ আলোচনা তাদের এত স্পষ্ট হয়ে উঠত না। উঠলেও এত সহজে সমাপ্তি লাভ না করে তাদের এমন কলহ হয়ে যেত যে, আগামী কাল পর্য্যন্ত পরস্পরকে তারা ঘৃণা করত। যাদের মধ্যে মনের চেনা নেই, শুদ্ধ শান্ত অপাপবিদ্ধ আত্মাকে পর্য্যন্ত এ অবস্থায় তারা ক্লেশ দেয়; বলে এই ভাখ, পাপ। তোমার পাপ, তোমার মহৎ চিত্তের মহাব্যাধি! অশোকের মধ্যস্থতাতেই কি সে আর সুপ্রিয়া পরিচয়ের এই নিম্নতম স্তর অতিক্রম করে এল? মুহূর্ত্তের তেজী হিংসার বশে সুপ্রিয়াকে ছাদ থেকে ঠেলে ফেলে দিতে চেয়ে অশোক কি তার আর সুপ্রিয়ার মধ্যে পরম সহিষ্ণুতা এনে দিয়েছে?

তাই যদি না হয়,—সুপ্রিয়ার প্রশান্ত মুখের দিকে চেয়ে হেরম্ব মনে

মনে তার এই চিন্তাকে ভাষায় উচ্চারণ করে,—সুপ্রিয়ার মুখের আলো নিভে যাবার কথা। তার শেষ কথায় সুপ্রিয়া তো কাঁদত।

হেরম্বের সবচেয়ে বিস্ময় বোধ হয় সুপ্রিয়ার দীর্ঘ নীরবতায়। নিরিবিলিতে কথা বলতে এসে তার কথা যেন ইতিমধ্যেই ফুরিয়ে গিয়েছে। বেলা শেষ হয়ে আসে, তবু সুপ্রিয়া কিছু বলে না। এই নীরবতা যে রাগ অথবা অভিমানের লক্ষণ নয় তাও সহজেই বোঝা যায়—সুপ্রিয়ার মুখে কোন অভিব্যঞ্জনা নেই বলে শুধু নয়, সরে সরে অতি নিকটে এসে তার আধ' অন্যমনস্ক বসবার ভঙ্গিতে। খোলা চুল সে আর বাঁধেনি, আঁচল জড়িয়ে গলার সঙ্গে বেঁধে ফেলেছে, অনাবৃত মাথায় শুধু কয়েকটি আল্‌গা চুল বাতাসে উড়ছে। হেরম্বের জামার যেটুকু বালিতে বিছানো হয়ে আছে তাতে সে পেতেছে হাত, সে হাতে দেহের ঊর্দ্ধাংশের ভর রেখে হাঁটু মুড়ে কাত হয়ে বসেছে। সে যেন হেরম্বকে উঠতে দেবে না, জামা ধরে বসিয়ে রাখবে। অথবা বৃন্তচ্যুত ফুলের মত হেরম্বের কোলে ঝরে পড়ার জন্য সে শুধু হাতটির অবশ হওয়ার প্রতীক্ষা করছে।

এখন একটু চেষ্টা করলেই হেরম্ব আনন্দকে ভুলে যেতে পারে। ফেননন্দিতা সাগরকূলে জনহীন দিবাবসানের বৈরাগ্যকে একটু প্রশ্রয় দেওয়া, সরল মনে একবার স্মরণ করা পার্শ্ববর্ত্তিনীর জীবনেতিহাস। সে তো কঠিন নয়। কত দিনের কত ক্ষুধা ও পিপাসা, কত স্বপ্ন ও সঙ্কল্প সঞ্চয় করে সুপ্রিয়া আজ এমন শিথিল ভঙ্গিতে এত কাছে বসেছে সে ছাড়া আর কার তা স্মরণীয়? নিজেকে হেরম্বের দুর্ব্বল ও অসহায় মনে হয়।

সুপ্রিয়া হঠাৎ মৃদু হেসে বলল, 'বাড়ীতে এখন আমার খোঁজ পড়েছে।'

হেরম্ব বলল, 'এবার ওঠা যাক্।'

'এখনি ? আগে সন্ধ্যা হোক, রাত্রি হোক, তখন যদি উঠি তো উঠব।'

'যদি ?'

'হ্যাঁ। সারারাত নাও উঠতে পারি, কিছু ঠিক নেই। বেশ বালির বিছানা পাতা আছে। বসতে কষ্ট হলে আপনি শুতে পারবেন। বৃষ্টি নামলে কষ্ট হবে।'

হেরম্ব অভিভূত হয়ে বলল, 'তারপর কি হবে ?'

'এখান থেকে ষ্টেশনে গিয়ে গাড়ীতে উঠব। আপনার কলেজ অনেকদিন খুলে গেছে। আর বেশী কামাই করলে চাকরী যাবে।'

হেরম্ব কথা বলতে পারল না।

সুপ্রিয়া বলল, 'চাকরী গেলে চলবে না, আমাদের টাকার দরকার হবে। ছোট বাড়ীতে আমি থাকতে পারব না। সাত-আটখানা ঘর আর খুব বড় খোলা ছাদ থাকা চাই।'

সুপ্রিয়ার এই অন্তিম আবেদন।

ভীরু হেরম্ব পকেট হাতড়ে চুরুট বার করল। অনেকক্ষণ সময় নিয়ে চুরুট ধরিয়ে বলল, 'টিকিটের টাকা আনতে একবার কিন্তু আশ্রমে যেতে হবে সুপ্রিয়া।'

সমস্ত রাত্রি সমুদ্রের ধারে কাটিয়ে পরদিন সকালে তাদের কলকাতা চলে যাবার মত বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণের সঙ্গে টিকিটের টাকার জন্য চিন্তিত

হওয়া এত বেশী তুচ্ছ যে, হেরম্ব ভাবতে পারল না, সুপ্রিয়া বুঝবে না এ শুধু তার সময়োচিত গম্ভীর পরিহাস, সুপ্রিয়ার প্রস্তাবকে এমনি ভাবে দুর্ব্বল হেরম্বের হেসে উড়িয়ে দেওয়া। সুপ্রিয়া কিন্তু সত্য সত্যই তার এই কথাকে স্বীকারোক্তি বলে ধরে নিল।

'তার দরকার নেই, আমার গায়ে গয়না আছে।'

একটু চিন্তা করে হেরম্ব বক্তব্য স্থির করে নিল।

'শোন্ সুপ্রিয়া। তোর বিয়ের সময় তোকে একটা উপহারও কিনে দিই নি। আর আজ তোর গয়না বিক্রির টাকায় কলকাতা যাব? এমন কথা তুই ভাবতে পারলি! একবার তোর ভয় হল না, লজ্জায় ঘৃণায় আমি তাহলে চলন্ত ট্রেণ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করব?'

সুপ্রিয়ার হাত এতক্ষণে হয়ত অবশ হয়ে এসেছিল, হাত মুচড়ে তার শরীরের আশ্রয়চ্যুত ঊর্দ্ধভাগ হেরম্বের কোলে হুমড়ি দিয়ে পড়লে অস্বাভাবিক হত না। কিন্তু সে সোজা হয়েই বসল। স্তব্ধ, নিশ্চল, কাঠের মূর্ত্তির মত। রূপাইকুড়ায় হেরম্বের সঙ্গে বেড়াতে গিয়ে শুকনো ঘাসে-ঢাকা মাঠে সে এমনিভাবে বসেছিল! হেরম্বের মনে আছে। তখন সূর্য্য অস্ত গিয়ে সন্ধ্যা হয়েছিল। আজ সূর্য্যাস্তের সূচনা মাত্র হয়েছে। ছোট একটি মেঘ এত জোরে ছুটে আসছে যে, সূর্য্যাস্তের আগেই সূর্য্যকে ঢেকে ফেলবে। সুপ্রিয়ার মুখ থেকে আকাশে দৃষ্টিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে যেতে হেরম্বের মুখও বিবর্ণ ম্লান হয়ে গেল। দু'হাতে ভর দিয়ে সে বসেছে। দুই করতলে সূক্ষ্ম শীতল বালির স্পর্শ অনুভব করে তার মনে হল, যে পৃথিবীর সবুজ তৃণাচ্ছাদিত হওয়ার কথা, তার আগাগোড়া হয়ে গেছে মরুভূমি।

অপরাধীর মত মন্থর পদে হেরম্ব আশ্রমে ফিরে এল। অন্ধকার বাগান পার হয়ে বাড়ীর রুদ্ধ দরজায় সে করাঘাত করল আস্তে। তারপর আনন্দের নাম ধরে ডাকল। অভিশপ্ত দেবদূতের মত মর্ত্যের প্রবাস সাঙ্গ করে সে যেন স্বর্গের প্রবেশ-পথে সসঙ্কোচে এসে দাঁড়িয়েছে। দরজা খোলার জোরালো দাবী জানবার সাহসও নেই।

আলো হাতে এসে দরজা খুলে আনন্দ নীরবে একপাশে সরে দাঁড়াল। হেরম্ব মৃদুস্বরে বলল, 'দেরী করে ফেলেছি, না ?'

'কোথায় ছিলে এতক্ষণ ?'

'সমুদ্রের ধারে খানিকক্ষণ বেড়িয়ে মন্দিরে গিয়েছিলাম।'

'তার বাড়ী যাও নি—সকালে যিনি এসেছিলেন ?'

'গিয়েছিলাম। তিনি আমার সঙ্গে সমুদ্রের ধারে বেড়াতে এলেন।

তাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে দেখি ঘুরতে ঘুরতে মন্দিরের সামনে এসে হাজির হয়েছি। মন্দিরে উঠে একটু বসলাম। মনটা ভাল ছিল না, আনন্দ।'

'কেন ?'

'তিনি বললেন, আমায় তিনি ভালবাসেন। আমি ভালবাসিনা বলায় মনে খুব ব্যথা পেলেন। কারো মনে ব্যথা দিলে মন খারাপ হয়ে যায় না ?'

দরজা বন্ধ করার জন্য আনন্দ হেরম্বের দিকে পিছন ফিরল। হেরম্বের মনে হল, এই ছুতায় সে বুঝি মুখের ভাব গোপন করছে। দরজায় খিল দিয়ে আনন্দ ঘুরে দাঁড়াতে বোঝা গেল, হেরম্বের অনুমান সত্য নয়। আনন্দ কখনো কিছু গোপন করে না।

'তিনি অনেক দিন থেকে তোমায় ভালবাসেন, না ?'

'তাই বললেন।'

দু'জনে তারা হেরম্বের ঘরে গেল। মালতীর কোন সাড়া-শব্দ নেই। সবগুলি আলো আজ জ্বালা হয় নি, বাড়ীতে আজ অন্ধকার বেশী, স্তব্ধতা নিবিড়। আলগোছে মেঝেতে আলোটা নামিয়ে রেখে আনন্দ বলল, 'আমার ভালবাসা দু'দিনের !'

হেরম্ব অনুযোগ দিয়ে বলল, 'কেন তুমি কেবলি দিনের হিসাব করছ আনন্দ ?'

কথাগুলি হঠাৎ যেন আক্রমণ করার মত শোনাল। আনন্দ থতমত খেয়ে বলল, 'না, তা করি নি। এমনি কথার কথা বললাম।'

হেরম্ব বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ল। 'কথার কথা কেউ বলে না আনন্দ,

আজ পর্য্যন্ত কারো মুখে আমি অর্থহীন কথা শুনি নি। তোমার ঈর্ষ্যা হয়েছে।'

হেরম্বকে আশ্চর্য্য করে দিয়ে সহজভাবে আনন্দ একথা স্বীকার করল, 'কেন তা হয়? আমার মন ছোট বলে?'

'ঈর্ষ্যা খুব স্বাভাবিক আনন্দ, সকলের হয়।'

'সকলের হোক, আমার কেন হবে?'

প্রশ্নটা হেরম্ব ঠিক বুঝতে পারল না। এ যদি আনন্দের অহঙ্কার হয় তবে কোন কথা নেই। কিন্তু সে যদি সরলভাবে বিশ্বাস করে থাকে যে তার অসাধারণ প্রেমে ঈর্ষ্যারও স্থান নেই, তাহলে হয়ত তাকে অনেকক্ষণ বকতে হবে। বলতে হবে, তোমার খিদে পায় না আনন্দ? মাঝে মাঝে প্রকৃতি তোমাকে শাসন করে না? হিংসাকে তেমনি প্রকৃতির নিয়ম বলে জেনো।

হেরম্ব কথা বলল না দেখে আনন্দ বোধ হয় একটু ক্ষুণ্ণ হল। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেইখানেই মেঝেতে সে বসল। তাকে চৌকীতে উঠে বসতে বলার মত মনের জোর হেরম্ব আজ খুঁজে পেল না। সমুদ্র-তীরের কলরব থেকে দূরে চলে আসার পর তার মনে যে স্তব্ধতার সৃষ্টি হয়েছিল, এখনো একটা ভারি আবরণের মত তা তার মনকে চাপা দিয়ে রেখেছে। সুপ্রিয়ার সেই হাতে ভর দিয়ে বসবার শিথিল ভঙ্গী মনে পড়ে। আসন্ন সন্ধ্যায় সুপ্রিয়া স্খলিত পদে তার পরিত্যক্ত গৃহে প্রবেশ করার পর অন্ধকার পথে দাঁড়িয়ে তার অন্তরের অমৃত-পিপাসাকে ছাপিয়ে যে কোটি ক্ষুধিত কামনার হাহাকার উঠেছিল, মাটির মানুষ হেরম্বকে এখনো তা আচ্ছন্ন করে

রেখেছে। তার দেহ শোকে অবসন্ন, মৃত্তিকার কীটদংশনে বিপন্ন তার মন।

'আমার আজ কি হয়েছে জান?'—আনন্দ বলল।

হেরম্ব জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, 'বল, শুনছি।'

'সকাল থেকে নিজেকে আমার অশুচি মনে হয়েছে। কেবলি ছোট কথা মনে হয়েছে, হীন অশুদ্ধ ভাব মনে এসেছে। রাগে হিংসায় ঘেন্নাতে আমি অস্থির হয়ে পড়েছি। ঠিক যেন নরকে বাস করেছি সারাটা দিন। এমন কষ্ট পেয়েছি আমি!' যে ছিল অবোধ নিষ্পাপ শিশু, আজ সে আত্মজ পাপে মাথা হেঁট করল, 'তাই তোমাকে বলেছিলাম সন্ধ্যার পর আমার কাছে থেকো, কোথাও যেও না। আমি নীচে নেমে গেছি, আমাকে তুমি তুলে নিতে পার?'

প্রথম দিন পূর্ণিমা রাত্রে নাচ শেষ না করে আনন্দ যে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করেছিল এখন তার নতমুখে তেমনি একটা যন্ত্রণার আভাস দেখে হেরম্ব ভয় পেল।

'এসব কি বলছ, আনন্দ?'

'মুখ দেখে বুঝতে পারছ না এখনো আমার মন নোংরা হয়ে আছে? একটা ভাল কথা ভাবতে পারছি না। আমার মনে এক ফোঁটা শান্তি নেই।'

হেরম্ব নির্বোধের মত কথা খুঁজে খুঁজে বলল, 'ঈর্ষ্যায় তো এরকম হয় না আনন্দ।'

আনন্দ বিরস কণ্ঠে বলল, 'কে বলেছে ঈর্ষ্যা? শুধু ঈর্ষ্যা হলে তো বাঁচতাম, আমি সবদিক দিয়ে খারাপ হয়ে গেছি। একটু আগে কি ভাবছিলাম জান?'

'কি ভাবছিলে ?'

'দেখ, বলতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে।'

'ফাটবে না, বল।'

আনন্দ আঙ্গুল দিয়ে মেঝেতে দাগ কাটতে কাটতে বলল, 'বলা আমার উচিত নয়। অন্য মেয়ে হয় তো বলতো না। তুমি তো জান আমি অন্য মেয়ের সঙ্গে বেশী মিশি নি। বলা অন্যায় হলে রাগ কোর না, আমায় ক্ষমা কোর। দেখ, আমি এত ছোট হয়ে গেছি, একটু আগে তোমাকে খারাপ লোক মনে করছিলাম।'

আনন্দ যে তার ঠিক কি ধরণের মানসিক অপরাধের কথা স্বীকার করছে হেরম্ব বুঝতে পারল না। তার মনে হল আনন্দের কথায় সুপ্রিয়া সংক্রান্ত কোন ইঙ্গিত আছে। আনন্দ না বুঝুক তার ঈর্ষ্যারই হয়ত এ একটা শোচনীয় রূপ। তবু কথাটা স্পষ্টভাবে না বুঝে সে কিছু বলতে সাহস পেল না। একটু উদ্বেগের সঙ্গে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন তা ভাবলে ?'

'তা জানি না। আমার মনে হল আমাকে দেখে তোমার লোভ হয়েছিল তাই আমাকে ভুলিয়েছ, আমার ছেলেমানুষীর সুযোগ নিয়ে।'

হেরম্ব আশ্চর্য্য হয়ে বলল, 'তোমায় দেখে কার লোভ হবে না, আনন্দ ? আমারও হয়েছিল। সেজন্য আমি খারাপ লোক হব কেন ?'

'লোভ হয়েছিল বলে নয়, শুধু লোভ হয়েছিল বলে। আমায় দেখে তোমার শুধু লোভই হয়েছিল, আর কিছু হয় নি।'

'অর্থাৎ আমার ভালবাসা-টাসা সব মিছে ?'

আনন্দ মুখ তুলে তিরস্কার করে বলল, 'রাগ করবে না বলে রাগ করছ যে?'

'রাগ করব না, এমন কথা আমি কখনো বলি নি।'

আনন্দের চোখ ছল্ ছল্ করে এল। সে আবার মাথা নীচু করে বলল, 'ঝগড়া করার সুযোগ পেয়ে তুমি ছাড়তে চাইছ না। আমি গোড়াতেই বলি নি আমি ছোটলোক হয়ে গেছি? আমার একটা খারাপ অসুখ হলে কি তুমি এমনি করে ঝগড়া করবে?'

হেরম্বের কথা সত্য সত্যই রুক্ষ হয়ে উঠছিল। সে গলা নরম করে বলল, 'ঝগড়া করি নি, আনন্দ। তুমি আমার সম্বন্ধে যা ভেবেছ তাতেও আমি রাগ করি নি। তুমি নিজেকে কি যেন একটা ঠাউরে নিয়েছ, আমার রাগের কারণ তাই। তুমি কি ভাব তুমি মানুষ নও, স্বর্গের দেবী? কখনো খারাপ চিন্তা তোমার মনে আসবে না? মানুষের মনে হীনতা আসে, মানুষ সেজন্য আত্মগ্লানি ভোগ করে, কিন্তু এই তুচ্ছ সাময়িক ব্যাপারে তোমার মত বিচলিত কেউ হয় না।'

আনন্দ বিবর্ণ মুখে বলল, 'আমার কি ভয়ানক কষ্ট হচ্ছে যদি জানতে—'

'জানি। হওয়া কিন্তু উচিত নয়। আজ তুমি একবার আমাকে বললে তোমার ভয় হচ্ছে, আমাদের ভালবাসা বুঝি মরেই গেল।—এখন বলছ আমি তোমাকে লোভ করেছি, ভালবাসি নি। এ সব চিত্তচাঞ্চল্য আনন্দ, বিচলিত হয়ে এ সমস্তকে প্রশ্রয় দিতে নেই।'

আনন্দ আবার মুখ তুলেছিল, তার তাকাবার ভঙ্গী দেখে হেরম্বের মন উদ্বেগে ভরে গেল। আনন্দ যেন তাকে চিনছে, আনন্দের দামী

দামী ভুল যেন ভেঙ্গে যাচ্ছে একে একে, তার বিস্ময়ের, বেদনার সীমা নেই। হেরম্ব নিজের ভুল বুঝে সভয়ে স্তব্ধ হয়ে গেল। তার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? এ কথা তার স্মরণ নেই যে তার মত আনন্দ আজ বাইরের পৃথিবীতে বেড়াতে যায় নি, পরম সহিষ্ণুতায় আলো ও অন্ধকারের যে সমন্বয় নিজের মধ্যে করে নিয়ে পৃথিবীর মানুষ ধৈর্য্য ধরে থাকে আনন্দের কাছে সে সহিষ্ণুতার নাম পরাজয়? সুপ্রিয়ার আবির্ভাবের আগে সে নিজে কি মন নিয়ে এখানে দিন কাটাচ্ছিল হেরম্বের সে কথা মনে পড়ে। এখানে আসবার আগে মনের সেই উদাত্ত উদ্বেগ অবস্থা তার কল্পনাতীত ছিল। কি সেই বিপুল একক পিপাসা,—প্রশান্ত, নিবিড়, অনির্ব্বচনীয়। এইখানে গৃহ-কোণে বসে সমগ্র অভিজাত মনোধর্ম্মের বিরাট সমন্বয়ে চেতনার সেই অনাবিল নিরবিচ্ছিন্ন পুলক-স্পন্দন, বিশ্বের একপ্রান্তের ভাঙ্গা কুটির থেকে অন্য প্রান্তের রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত প্রসারিত হৃদয়ে নিখিল-হৃদয়ের জীবনোৎসব, অনন্ত, উদার উপলব্ধির মেলা! সেই মনে ছোট স্নেহ, ছোট মমতাকে কে খুঁজে পেয়েছে? সে মনের আলো ছিল দিন, অন্ধকার ছিল রাত্রি,—অঙ্গনে বিছানো এক টুকরো রোদ আর তরুতলের ক্ষীণ ছায়ার যোগাযোগ আগের মত মনের আলো-ছায়ার খেলা সাঙ্গ হয়ে যেত না। সুপ্রিয়াকে মনে করতে হলে সেই মন নিয়ে হেরম্বকে সহরের ধূলিভরা পথে পথে বেড়াতে হত। আর আজ সুপ্রিয়ার কাছ থেকে পরিবর্ত্তিত, ছোট মমতায় ছোট সুখদুঃখে উদ্বেলিত মন নিয়ে এসে সে কি বলে এত সহজে আনন্দের মনের বিচার করে রায় দিচ্ছে?

হেরম্বের অনুশোচনার সীমা রইল না। তাই আনন্দ যখন বলল, 'তোমার আজ কি হয়েছে, তুমি কিছুই বুঝতে চাইছ না কেন?'—তখন সে বিহ্বলের মত আনন্দের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, কথা বলতে পারল না।

আনন্দ তাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করে বলল, 'দেখ, তুমি প্রথম যেদিন এলে সেদিন থেকে আমি যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলাম। জেগে ঘুমিয়ে আমি যেন স্বপ্ন দেখতাম। সব সময় একটা আশ্চর্য্য সুর শুনছি, নানা রকম রঙীন আলো দেখছি, একটা কিসের ঢেউয়ে আস্তে আস্তে দোল খাচ্ছি—' বিস্ফারিত চোখে হেরম্বের দিকে চেয়ে আনন্দ মাথা নাড়ল, 'বলতে পারছি না যে? আমি যে সব ভুলে গেছি?'

তার ভুলে যাওয়ার অপরাধ যেন হেরম্বের, এমনি তীব্রস্বরে সে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করল, 'কেন ভুলে গেলাম? কেন বলতে পারছি না?'

হেরম্ব অস্ফুট স্বরে বলল, 'ভোলো নি আনন্দ। ওসব কথা মুখে বলা যায় না।'

কিন্তু আনন্দ একান্ত অবুঝ।—'কেন বলা যাবে না? না বললে তুমি যে কিছু বুঝবে না। সব কি রকম স্পষ্ট ছিল জান? আমার এক এক সময় নিশ্বাস ফেলতে ভয় হত, পাছে সব শেষ হয়ে যায়।'

হেরম্ব কথা বলে না। উত্তেজিত আনন্দও অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে শান্ত হয়।

'আমার আশে-পাশে কি ঘটত ভাল জ্ঞান ছিল না। কলের মত নড়া-চড়া করতাম। তারপর যেদিন থেকে মনে হল আমাদের ভালবাসা

মরে যাচ্ছে সেদিন থেকে কি কষ্ট যে পাচ্ছি ! আচ্ছা শোন, তোমার কি খুব গরম লাগছে ? ঘাম হচ্ছে ?'

'না, আজ তো গরম নেই ।'

আনন্দ উঠে এসে বলল, 'দেখ, আমি ঘেমে নেয়ে উঠেছি। আমার কি হয়েছে ?'

হেরম্ব গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে বলল, 'শান্ত হয়ে বোসো। তোমার জ্বর হয়েছে ।'

ধীরে ধীরে রাত্রি বেড়ে চলে। আশে-পাশে অসংখ্য ঝিঁঝিঁ আর ব্যাঙের ডাক শোনা যায়। আনন্দকে সান্ত্বনা ও শান্তি দেবার দুঃসাধ্য প্রয়াস একবার প্রাণপণে করে দেখবার জন্য হেরম্বের ঝিমানো মন মাঝে মাঝে সতেজে সচেতন হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু আজ কোথায় সেই উদ্ধত উৎসাহ, অদম্য প্রাণশক্তি ! চিন্তা কষ্টকর, জিহ্বা আড়ষ্ট, কথা সীসার মত ভারী। মুখ গুঁজে সর্ব্বনাশকে বরণ করা ছাড়া আর যেন উপায় নেই। স্বর্গ চারদিকে ভেঙ্গে পড়ুক। মোহে অন্ধ রক্ত-মাংসের মানুষের অমৃতের পুত্র হবার স্পর্দ্ধা ধূলায় লুটিয়ে যাক ।

প্রেম ? মানুষের নব ইন্দ্রিয়ের নবলব্ধ ধর্ম্ম ? সে সৃষ্টি করেছে। এবার যে পারে বাঁচিয়ে রাখুক। তার আর ক্ষমতা নেই ।

আনন্দ কাঁদ-কাঁদ হয়ে বলেছিল, 'তুমিও আমায় ভাসিয়ে দিলে ?'

হেরম্ব শ্রান্তস্বরে বলেছিল, 'কাল সব ঠিক হয়ে যাবে, আনন্দ ।'

এ স্পষ্ট প্রতারণা। কিন্তু উপায় কি ?

আজ রান্না হয় নি। কিন্তু সেজন্য হেরম্বের আহারের কোন ত্রুটি

হল না। ফল, দুধ এবং বাসি মিষ্টির অভাব আশ্রমে কখনো হয় না, ভাতের চেয়ে এ সব আহার্য্যের মর্য্যাদাই এখানে বেশী, মালতীর স্থায়ী ব্যবস্থা করা আছে। আনন্দ প্রথমে কিছু খেতে চাইল না। কিন্তু হেরম্ব তার ক্ষুধার সঙ্গে তার মানসিক বিপর্য্যয়ের একটা সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করায় রাগ করে একরাশ খাবার নিয়ে সে খেতে বসল।

হেরম্ব বলল, 'সব খাবে ?'

'খাব।'

'তোমার সুমতি দেখে খুসী হলাম, আনন্দ।'

সে চিৎ হয়ে শুয়ে চোখ বোজা মাত্র আনন্দ সব খাবার নিয়ে বাইরে ফেলে মুখ হাত ধুয়ে এল। হেরম্বের বালিশের পাশে এলাচ লবঙ্গ ছিল, একটি এলাচ ভেঙ্গে অর্দ্ধেক দানা সে হেরম্বের মুখে গুঁজে দিল। বাকীগুলি নিজের মুখে দিয়ে বলল, 'আমি শুতে যাই ?'

হেরম্ব চোখ মেলে বলল, 'যাও।'

যেতে চাওয়া এবং যেতে বলা তাদের আজ উচ্চারিত শব্দগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে রইল।

হেরম্ব ভেবেছিল আজ বুঝি তার সহজে ঘুম আসবে। দেহ-মনের শিথিল অবসন্নতা অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর তন্দ্রায় ডুবে যাবে। কিন্তু কোথায় ঘুম ? কোথায় এই সকাতর জাগরণের অবসান ? ঘরের কমানো আলোর মত স্তিমিত চেতনা একভাবে বজায় থেকে যায়, বাড়েও না কমেও না। হেরম্ব উঠে বাইরে গেল। মালতী আজ তার নিজের ঘর ছেড়ে অনাথের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে, মালতীর ঘরে শিকল

তোলা। আনন্দই বোধ হয় সন্ধ্যার সময় এ ঘরে একটি প্রদীপ্ জ্বেলে দিয়েছিল, জানালা দিয়ে হেরম্বের চোখ পড়ল তেল নিঃশেষ হয়ে প্রদীপের বুকে দপ্ দপ্ করে সলতে পুড়ছে। নিজের ঘর থেকে লণ্ঠন এনে হেরম্ব চোরের মত শিকল খুলে মালতীর ঘরে ঢুকল। আলমারিতে ছিল মালতীর কারণের ভাণ্ডার, কিন্তু সবই সে প্রায় আজ অনাথের ঘরে সঙ্গে নিয়ে গেছে। খুঁজে খুঁজে কাশীর একটি কাজকরা ছোট কালোরঙের মাটির পাত্রে হেরম্ব অল্প একটু কারণ পেল। তাই এক নিশ্বাসে পান করে আবার চুপি চুপি ঘরের শিকল তুলে নিজের ঘরে ফিরে গেল।

কিন্তু মালতীর কারণে নেশা আছে, নিদ্রা নেই। হেরম্বের অবসাদ একটু কমল, ঘুম এল না। বিছানায় বসে জানালা দিয়ে সে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল।

এমন সময় শোনা গেল মালতীর ডাক। হেরম্ব এবং আনন্দ ছু'জনের নাম ধরে সে গলা ফাটিয়ে চীৎকার করছে।

ছু'জনে তারা প্রায় একসঙ্গেই মালতীর ঘরে প্রবেশ করল। অনাথের প্রায় আসবাবশূন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ঘরখানা মালতী এক বেলাতেই নোংরা করে ফেলেছে। সমস্ত মেঝেতে কাদামাখা পায়ের শুকনো ছাপ, এক কোণে অভুক্ত আহার্য্য, এখানে-ওখানে ফলের খোসা ও আমের আঁটি। একটি মাটির পাত্র ভেঙ্গে কারণের স্রোত নর্দ্দমা পর্য্যন্ত গিয়েছিল, এখনো সেখানে খানিকটা জমা হয়ে আছে। ঘরে তীব্র গন্ধ।

কিন্তু মালতীকে দেখেই বোঝা গেল বেশী কারণ সে খায় নি। তার দৃষ্টি অনেকটা স্বাভাবিক, কথাও স্পষ্ট।

বলল, 'একা একা আমার ভয় করছে হেরম্ব।'

হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল, 'কিসের ভয় ?'

মালতী বলল, 'তা জানি নে হেরম্ব, ভয়ে আমার হৃৎকম্প হচ্ছিল। তোমরা এ ঘরে শোও।'

হেরম্ব অবাক হয়ে বলল, 'তার মানে ?'

মালতী বলল, 'মানে আবার কি, মানে ? বলছি আমার ভয় করছে, একা থাকতে পারব না, আবার মানে কিসের ? ঝাঁটা এনে ঘরটা একটু ঝাঁট দিয়ে বিছানা পাত আনন্দ।'

হেরম্ব বলল, 'আনন্দ আপনার কাছে থাক, আমার থাকবার দরকার নেই।'

মালতী বলল, 'না বাপু না, আনন্দ থাকলে হবে না। ও ছেলেমানুষ, আমার ভয় করবে।'

হেরম্ব আনন্দের মুখের দিকে তাকাল। আনন্দের নির্ব্বিকার মুখ থেকে কোন ইঙ্গিত পাওয়া গেল না। হেরম্ব বলল, 'তাহলে সবাই অন্য ঘরে যাই চলুন। এ ঘরে শোয়া যাবে না।'

মালতী রেগে বলল, 'তুমি বড় বাজে বক, হেরম্ব। বাহাদুরি না করে যা বলছি তাই কর দিকি। যা আনন্দ, ঝাঁটা নিয়ে আয়।'

ঝাঁটা এনে আনন্দ ঘর ঝাঁট দিল। মালতীর নির্দ্দেশ মত মন্দিরের দিকে জানালা ঘেঁষে হেরম্বের বিছানা হল। মা'র অবাধ্য হয়ে মালতীর বিছানা থেকে যতটা পারে দূরে সরিয়ে শুধু একটি মাদুর পেতে আনন্দ নিজের বিছানা করল। মালতীর অনুযোগের জবাবে রুক্ষস্বরে বলল, 'আমি কারো কাছে শুতে পারি না।'

যে যার শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করলে মালতী বলল, 'সজাগ থেকে ঘুমিও হেরম্ব, ডাকলে যেন সাড়া পাই।'

হেরম্ব বলল, 'সজাগও থাকব, ডাকলে সাড়াও পাবেন, এ রকম ঘুম ঘুমোব কি করে? তার চেয়ে আমি উঠে বসে থাকি।'

মালতী ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'ইয়ার্কি দিও না হেরম্ব। আমার এদিকে মাথার ঠিক নেই, উনি ঠাট্টা জুড়লেন!'

সজাগ হেরম্ব বিনা চেষ্টাতেই হয়ে রইল। দু'টি নারীকে এভাবে পাহারা দিয়ে ঘুমানোর চেয়ে জেগে থাকাই সহজ।

ঘর স্তব্ধ হয়ে থাকে। আনন্দ নিজের আঁচলে মুখ ঢেকে শুয়েছে. লণ্ঠনের আলো দেয়ালে তার যে ছায়া ফেলেছে তাকে মানুষের ছায়া বলে চেনা যায় না। অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘরে কে ঘুমিয়েছে কে জেগে আছে টের পাওয়া অসম্ভব হয়।

মালতী আস্তে আস্তে হেরম্বের সাড়া নেয়।—'হেরম্ব?'

'ভয় নেই, জেগেই আছি।'

'আচ্ছা, বল দিকি একটা কথা। একটা মানুষকে খুঁজে বার করতে হলে কি করা উচিত?'

'খুঁজতে বার হওয়া উচিত।'

'যাবে হেরম্ব? ক'দিন দেখ না একটু খোঁজ-টোজ করে। খরচ যা লাগে আমি দেব।'

হেরম্ব নির্ম্মম হয়ে বলল, 'মাষ্টারমশায় কি ছোট ছেলে যে খুঁজে পেলে ধরে আনা যাবে? আপনি তো চেনেন তাঁকে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ তাঁকে দিয়ে করানো যায়?'

মালতী খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।

'হেরম্ব ?'

'বলুন, শুনছি।'

'আচ্ছা, এরকম তো হতে পারে চলে গিয়ে ফিরে আসতে ইচ্ছা হয়েছে, লজ্জায় আসতে পারছে না ? ক্ষ্যাপা মানুষ ঝোঁকের মাথায় চলে গিয়ে হয়ত আপশোষ করছে। কেউ গিয়ে ডাকলেই আসবে ?'

হেরম্ব এবারও নির্ম্মম হয়ে বলল, 'এমনি যদিও বা আসেন, খোঁজা-খুঁজি করে বিরক্ত করলে একেবারেই আসবেন না।'

মালতীর কণ্ঠে হেরম্ব কান্নার আভাস পেল।

'তোমার মুখে পোকা পড়ুক হেরম্ব, পোকা পড়ুক। তুমিই শনি হয়ে এ বাড়ীতে ঢুকেছ। তুমি যেই এলে ওমনি একটা লোক গৃহত্যাগী হল। কই আগে ত যায় নি।'

হেরম্ব চুপ করে থাকে। আনন্দ মৃদুস্বরে বলে, 'ঘুমোও না, মা।'

মালতী তাকে ধমক দিয়ে বলে, 'তুই জেগে আছিস বুঝি ? আমাদের পরামর্শ শুনছিস ?'

'তোমাদের পরামর্শের চোটেই যে ঘুম আসছে না।'

জবাবে স্বাভাবিক কড়া কথার বদলে মালতী হঠাৎ মিনতির সুরে যা বলল শুনে হেরম্বের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

'আনন্দ, আয় না মা, আমার কাছে এসে একটু শো। আয়।'

হেরম্ব আরও বিস্মিত হল আনন্দের নিষ্ঠুরতায়।

'রাত দুপুরে পাগলামি না করে ঘুমোও তো।'

হেরম্বের অভিজ্ঞতায় মালতী আজ প্রথম ধমক খেয়ে চুপ করে রইল।

এতক্ষণে হেরম্বের মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করছে। এ আশ্রম অভিশপ্ত, মালতীর যুগব্যাপী অন্ধ অতৃপ্ত ক্ষুধায় এখানকার বাতাসও বিষাক্ত হয়ে আছে। গভীর নিশীথে এখানে মালতীর সঙ্গে একঘরে জেগে থাকলে দু'দিনে মানুষ পাগল হয়ে যাবে।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে মালতী ডাকল, 'আনন্দ, ঘুমুলি ?' আনন্দ সাড়া দিল না।

মালতী উঠে বসল।—'হেরম্ব ?'

'জেগেই আছি।'

'আমার বুকে আগুন জ্বলছে হেরম্ব। আমি এখানে নিশ্বাস নিতে পারছি না। দম আট্‌কে আট্‌কে আসছে।'

'একটু ধৈর্য্য না ধরলে—'

মালতী বাধা দিয়ে বলল, 'কিছু বোল না হেরম্ব। একবার ওঠ দিকি। শব্দ কোর না বাপু, মেয়ের ঘুম ভাঙ্গিও না।'

মালতী উঠে দাঁড়াল। আনন্দের কাছে গিয়ে সে ঘুমন্ত মেয়ের দিকে তাকিয়ে রইল পলকহীন চোখে। হেরম্ব উঠে এলে ফিস্ ফিস্ করে বলল, 'দেখ, মুখ ঢেকে ঘুমিয়েছে। ওকে না জাগিয়ে মুখ থেকে কাপড়টা সরাতে পার হেরম্ব ? একবার মুখখানা দেখি।'

হেরম্ব সন্তর্পণে আনন্দের মুখ থেকে আঁচল সরিয়ে দিল। খানিকক্ষণ একদৃষ্টে আনন্দের মুখ দেখে হাত দিয়ে তার চিবুক ছুঁয়ে মালতী চুমো খেল। তারপর পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

থামল সে একেবারে বাড়ীর বাইরে বাগানে। হেরম্ব তাকে অনুসরণ করল নীরবে।

মালতী আঁচল থেকে চাবি খুলে হেরম্বের হাতে দিল।

'আমি চললাম হেরম্ব।'

হেরম্ব শান্তকণ্ঠে বলল, 'চলুন, আমিও যাচ্ছি।'

মালতী বলল, 'তুমিও ক্ষেপলে নাকি? আনন্দ একা রইল, তুমিও যাচ্ছ! আনন্দের চেয়ে আমার জন্যই তোমার মায়া বুঝি উথলে উঠল?'

হেরম্ব বলল, 'আপনার সম্বন্ধে আমার একটা দায়িত্ব আছে। রাতদুপুরে আপনাকে আমি একা যেতে দিতে পারি না।'

মালতী বলল, 'পাগলামি কোর না হেরম্ব। প্রথম বয়সে একবার রাতদুপুরে ঘর ছেড়েছিলাম, মা-বাবা ভাই-বোন কেউ ঠেকাতে পারে নি। পোড় খেয়ে খেয়ে এখন তো পেকে গেছি, তুমি আমাকে আটকাবে? শুধু যে নিজের জ্বালায় চলে যাচ্ছি তা ভেব না হেরম্ব। আমার মত মা কাছে থাকলে আনন্দ শান্তি পাবে না। আমি কারণ খাই, আমার মাথা খারাপ, আমার স্বভাব বড় মন্দ হেরম্ব। তোমার মাষ্টারমশায় আমাকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে।'

হেরম্ব চুপ করে থাকে। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ বাতাসের বেগে ছুটে চলছিল। এখানে দাঁড়িয়ে সমুদ্রের ডাক শোনা যায়।

'আনন্দকে দেখো হেরম্ব। দুঃখ দিও না ওকে। তোমার মাষ্টারমশায়ের হাতে আমার যে দুর্দ্দশা হয়েছে ওর যেন সেরকম না হয়। টাকা পয়সা যা রোজগার করেছি সব রেখে গেলাম। আমার ঘরে যে কাঠের সিন্দুক আছে, তাতে সোনার গয়না আর রূপার বাসন-কোসন পাবে। সবচেয়ে বড় চাবিটা সিন্দুকের তালার। মন্দিরে ঠাকুরের আসনের পিছনে একটা ঘটিতে সতেরোটা মোহর আছে, ঘরে নিয়ে

রেখো। এখানে বেশী দেরী না করে তোমরা কলকাতায় চলে যেও। ঠাকুরের জন্য ভেব না, আমি পূজার ব্যবস্থা করব।'

হেরম্ব জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি যাচ্ছেন কোথায়?'

মালতী বলল, 'আনন্দকে বোল আমি তার বাবাকে খুঁজতে গেছি। আর তোমার মাষ্টারমশায় যদি কোনদিন ফেরে, তাকে বোল আমি গোঁসাই ঠাকুরের আশ্রমে আছি, দেখা করতে গেলে কুকুর লেলিয়ে দেব।'

মালতী হাঁটতে আরম্ভ করল। বাগানের গেটের কাছে গিয়ে বলল, 'ঘরে যাও হেরম্ব। আর শোন, আনন্দকে তুমি বিয়ে করবে তো?'

'করব।'

'কোর, তাতে দোষ নেই। আনন্দ জন্মাবার আগেই আমাদের বৈরিগী মতে বিয়ে হয়েছিল হেরম্ব—সাক্ষী আছে। একদিন কেমন খেয়াল হল, দশজন বৈষ্ণব ডেকে অনুষ্ঠানটা করে ফেললাম। আনন্দকে তুমি যদি সমাজে দশজনের মধ্যে তুলে নিতে পার হেরম্ব—' অন্ধকারে মালতী ব্যাকুল দৃষ্টিতে হেরম্বের মুখের ভাব দেখবার চেষ্টা করল, 'ভদ্রলোকের সংসর্গই আলাদা।'

হেরম্ব মৃদুস্বরে বলল, 'তাই নেব মালতী-বৌদি।'

রাস্তায় নেমে মালতী সহরের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করল।

ঘরে ফিরে গিয়ে হেরম্ব দেখল, আনন্দ বিছানায় উঠে বসে আছে। হেরম্বও বসল।

'তোমার মা মাষ্টার-মশায়কে খুঁজতে গেছেন আনন্দ।'

আনন্দ বলল, 'জানি।'

'তুমি জেগে ছিলে নাকি ?'

'এ বাড়ীতে মানুষ ঘুমোতে পারে ? এ ত' পাগলা গারদ।'

আনন্দের কথার সুরে হেরম্ব বিস্মিত হল। সে ভেবেছিল মালতী চলে গেছে শুনলে আনন্দ একটু কাঁদবে। মালতীকে এত রাত্রে এভাবে চলে যেতে দেওয়ার জন্য তাকে সহজে ক্ষমা করবে না। কিন্তু আনন্দের চোখে সে জলের আভাসটুকু দেখতে পেল না। বরং মনে হল, কোমল উপাধানে মাথা রেখে ওর যে দুটি চোখের এখন নিদ্রায় নিমীলিত হয়ে থাকার কথা, তাতে একটা অস্বাভাবিক দীপ্তি দেখা দিয়েছে।

হেরম্ব বলল, 'আমি আটকাবার কত চেষ্টা করলাম, সঙ্গে যেতে চাইলাম—'

'কেন ভোলাচ্ছ আমাকে ? আমি সব জানি। আমিও উঠে গিয়েছিলাম।'

হেরম্ব আনন্দের দিকে তাকাতে পারল না। আনন্দকে একটু মমতা জানাবার সাধও সে চেপে গেল। সে বড় বেমানান হবে। কাল হয়ত সে আনন্দের চোখে চোখে তাকিয়ে কথা বলতে পারবে, আনন্দের চুল নিয়ে নাড়াচাড়া করতে পারবে, আনন্দের বিবর্ণ কপোলে দিতে পারবে সস্নেহ চুম্বন। আজ স্নেহের চেয়ে, সহানুভূতির চেয়ে বেখাপ্পা কিছু নেই। যতক্ষণ পারা যায় এমনি চুপচাপ বসে থেকে, বাকী রাতটুকু আজ তাদের ঝিমিয়ে ঝিমিয়েই কাটিয়ে দিতে হবে। আজ রাত্রি প্রভাত হলে সে আর একটা দিনও এই অভিশপ্ত গৃহের বিষাক্ত আবহাওয়ায় বাস করবে না। আনন্দের হাত ধরে যেখানে খুসী চলে যাবে।

আনন্দ কথা বলল। 'আমি কি ভাবছি জান?'

'কি ভাবছ আনন্দ?'

'ভাবছি, আমারও যদি একদিন মা'র মত দশা হয়?'

হেরম্ব সভয়ে বলল, 'ওসব ভেব না আনন্দ।'

আনন্দ তার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে পড়ল। রুদ্ধ উত্তেজনায় তার দু'চোখ জ্বল জ্বল করছে, তার পাণ্ডুর কপোলে অকস্মাৎ অতিরিক্ত রক্ত এসে সঙ্গে সঙ্গে বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে।

'মানুষের ভাগ্যে আমার আর বিশ্বাস নেই। তোমার সঙ্গে আমার ক'দিনের পরিচয়, এর মধ্যে আমার শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। দু'দিন পরে কি হবে কে জানে!'

'শান্তি ফিরে আসবে আনন্দ।'

আনন্দ বিশ্বাস করল না, 'আসবে কিন্তু টি'কবে কি! হয়ত আমিও একদিন তোমার দু'চোখের বিষ হয়ে দাঁড়াব। প্রথম দিন তুমি আর আমি কত উঁচুতে উঠে গিয়েছিলাম, স্বর্গের কিনারায়। আজ কোথায় নেমে এসেছি!'

'আমরা নামি নি আনন্দ, সবাই মিলে আমাদের টেনে নামিয়েছে। আমরা আবার উঠব। লোকালয়ের বাইরে আমরা ঘর বাঁধব, কেউ আমাদের বিরক্ত করতে পারবে না।'

আনন্দ বলল, 'বিরক্ত আমরা নিজেদের নিজেরাই করব। আমরা মানুষ যে!'

আনন্দ কি মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়েছে? স্বপ্ন ক্ষুণ্ন হবার অপরাধে মানুষকে কি সে ঘৃণা করতে আরম্ভ করল? জেনে নিল, বৃহত্তর জীবনে

মানুষের অধিকার নেই? বিগত-যৌবন প্রেমিকের কাছে প্রতারিত হয়ে তাই যদি আনন্দ জেনে থাকে, তবে তার অপরাধ নেই, কিন্তু এই সাংঘাতিক জ্ঞান বহন করে সে দিন কাটাবে কি করে? হেরম্বের বুক হিম হয়ে আসে—কোথায় সেই প্রেম? পূর্ণিমা তিথির এক সন্ধ্যায় সে যা সৃষ্টি করেছিল? আজ রাত্রিটুকুর জন্য সেই অপার্থিব চেতনা যদি সে ফিরে পেত! হয়ত কোন এক আগামী সন্ধ্যায় সেই পূর্ণিমার সন্ধ্যাকে সে ফিরে পাবে। আজ সে আনন্দকে সান্ত্বনা দেবে কি দিয়ে?

হেরম্বের মুখের দিকে খানিকক্ষণ ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে আনন্দ চোখ বুজল।—'ঘুমবে?' হেরম্ব বলল।

আনন্দ বলল, 'না।'

হেরম্ব বলল, 'না যদি ঘুমও আনন্দ, তবে আমাকে নাচ দেখাও। তোমার নাচের মধ্যে আমাদের পুনর্জ্জন্ম হোক।'

আনন্দ চোখ মেলে বলল, 'নাচব?'

চোখের পলকে রক্তের আবির্ভাবে আনন্দের মুখের বিবর্ণতা ঘুচে গেছে। হেরম্ব তা লক্ষ্য করল। তার বুকেও ক্ষীণ একটা উৎসাহের সাড়া উঠল।

'তাই কর আনন্দ, নাচ। আমরা একেবারে ঝিমিয়ে পড়েছি না? আমাদের জড়তা কেটে যাক।'

আনন্দ উঠে দাঁড়াল। বলল, 'তাই ভাল। নাচই ভাল। উঃ, ভাগ্যে তুমি বললে! নাচতে পেলে আমার মনের সব ময়লা কেটে যাবে, সব কষ্ট দূর হবে।'

আনন্দ টান দিয়ে আল্‌গা খোঁপা খুলে ফেলল।—'চল উঠানে যাই।

আজ তোমাকে এমন নাচ দেখাব তুমি যা জীবনে কখনো দেখ নি। দেখো, তোমার রক্ত টগ্‌বগ্‌ করে ফুটবে। এই দেখ, আমার পা চঞ্চল হয়ে উঠেছে!’

আনন্দের এই সংক্রামক উন্মাদনা আনন্দের নৃত্যপিপাসু চরণের মত হেরম্বের বুকের রক্তকে চঞ্চল করে দিল। শক্ত করে পরস্পরের হাত ধরে তারা খোলা উঠানে গিয়ে দাঁড়াল। সকালে ঝড়বৃষ্টির পর যে রোদ উঠেছিল তাতে উঠান শুকিয়ে গিয়েছিল, তবু উঠানভরা বর্ষাকালের বড় বড় তৃণের স্পর্শ সিক্ত ও শীতল। আনন্দের নাচের জন্যই যেন নিশীথ আকাশের নীচে এই সরস কোমল গালিচা বিছানো আছে।

‘কি নাচ নাচবে আনন্দ? চন্দ্রকলা?’

‘না। সে তো পূর্ণিমার নাচ। আজ অন্য নাচ নাচব।’

‘নাচের নাম নেই?’

‘আছে বৈকি। পরীনৃত্য। আকাশের পরীরা এই নাচ নাচে। কিন্তু আলো চাই যে?’

‘আলো জ্বালছি আনন্দ।’

ঘরে ঘরে অনুসন্ধান করে হেরম্ব তিনটি লণ্ঠন আর একটি ডিবরি নিয়ে এল। আলোগুলি জ্বেলে সে ফাঁকে ফাঁকে বসিয়ে দিল।

আনন্দ বলল, ‘এ আলোতে হবে [illegible]। আরো আলো চাই। তুমি এক কাজ কর, রান্নাঘরে কাঠ আ[illegible] এনে একটা ধুনি জ্বেলে দাও।’

‘ধুনি আনন্দ?’

আনন্দ অধীর হয়ে বলল, ‘কেন দেরী করছ? কথা কইতে আমার ভাল লাগছে না। ঝোঁক চলে গেলে কি করে নাচব?’

আনন্দ উত্তেজনায় থর্ থর্ করে কাঁপছিল। ওর মুখ দেখে হেরম্বের একটু ভয় হল। ক'দিন থেকে যে বিষণ্ণতা আনন্দের মুখে আশ্রয় নিয়েছিল তার চিহ্নও নেই, প্রাণের ও পুলকের উচ্ছ্বাস তার চোখে মুখে ফুটে বার হচ্ছে। দাঁড়িয়ে আনন্দকে দেখবার সাহস হেরম্বের হল না। রান্নাঘর থেকে সে এক বোঝা কাঠ নিয়ে এল।

আনন্দ বলল, 'আরো আনো, যত আছে সব।'

'আর কি হবে?'

'নিয়ে এস, আরো লাগবে। যত আলো হবে নাচ তত জমবে যে। পরী কি অন্ধকারে নাচে?'

রান্নাঘরে যত কাঠ ছিল বয়ে এনে হেরম্ব উঠানে জমা করল। আনন্দের মুখে আজ মিনতি নেই, অনুরোধ নেই, সে আদেশ দিচ্ছে। মনে মনে ভীত হয়ে উঠলেও প্রতিবাদ করার ইচ্ছা হেরম্ব দমন করল। আনন্দ যা বলল নীরবে সে তাই পালন করে গেল। মালতীর ঘর থেকে এক টিন ঘি এনে কাঠের স্তূপে ঢেলে দিয়ে কিন্তু সে চুপ করে থাকতে পারল না।

'ভয়ানক আগুন হবে, আনন্দ।'

আনন্দ সংক্ষেপে বলল, 'হোক।'

'বাড়ীতে আগুন লেগেছে [redacted]কে হয়ত ছুটে আসবে।'

'এদিকে লোক কোথায়? [redacted] তো আসবে। দাও এবার জেলে দাও।'

আগুন ধরিয়ে হেরম্ব আনন্দের পাশে এসে দাঁড়াল। বিরাট যজ্ঞানলের মত ঘৃতসিক্ত কাঠের স্তূপ হু হু করে জ্বলে উঠল। সমস্ত